(ষট্‌চক্রের চিত্র সমেত)।

বেদান্তদর্শন ও রাজযোগ।

জ্ঞান-গুরু-যোগী পূজ্যপাদ

শ্রীমৎ সভাপতি-স্বামী কর্ত্তৃক

কথিত।

শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু বি, এল

কর্ত্তৃক সঙ্কলিত এবং সুশ্রুত-সংহিতার

অনুবাদক

শ্রীঅম্বিকাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দ্বারা

বাঙ্গালা ভাষায় অনূদিত ও সংস্কৃত।

বহুবাজার ১২ নং বাঞ্ছারাম অক্রুরের লেন, সৌশ্রুত কার্য্যালয়

হইতে

শ্রীঅনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

প্রকাশিত।

কলিকাতা।

৪ নং রমানাথ মজুমদারস্ ষ্ট্রীট, এক্‌সেলসিয়র প্রেসে

শ্রীশশিভূষণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৯ সাল।

দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞাপন।

গভীর-তমসাবৃত অলক্ষ্য-মধ্যযুগের পর প্রান্ত হইতে এই সুবিস্তৃত বঙ্গভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সুস্পষ্ট অনুভূত হয় যে নবযুগের নবীন-জ্যোতিঃধারায় এতকালের সমাচ্ছন্ন আঁধার-রাশি অল্পে অল্পে অপসারিত হইয়া আজি যেন ইহার কালিমা-ময়-হৃদয়ের প্রত্যেক কন্দর গুলি আলোকিত হইয়া উঠিতেছে। সেই ভীষণান্ধকারে আত্মহারা ও মদিরাময়ী-পাশ্চত্য-শিক্ষার মোহ-মত্ততায় মাতোয়ারা বঙ্গসন্তানগণ যেন নবালোকে ধীরে ধীরে নয়ন মেলিয়া আপনাকে চিনিতে প্রয়াস পাইতেছে। বহু-কালের দাসত্ব এবং আসঙ্গে সেই সকল বঙ্গসন্তানের পর-দৃষ্টিতে দর্শন, পর-কর্ণে শ্রবন, পর-চিন্তায় চিন্তনময় পরাস্তিত্বে-আত্ম-বিস্মৃতি অপগত হইয়া স্বাধীন-জাতীয়-অস্তিত্বের ভূত কথা যেন ক্রমে ক্রমে স্মরণপথে উদিত হইতেছে। সঙ্গে সঙ্গে এতকালের অনাদৃত ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আত্ম-সত্ব সমূহের অনুসন্ধিৎসাও জাগ-রিত হইয়া উঠিতেছে। তন্মধ্যে যুপ্ত দুর্ভেদ্য-কুহেলিকাচ্ছন্ন প্রাচীন-হিন্দু-তত্ত্ব-শাস্ত্রের সুবিমল-প্রশান্ত-জ্যোতিঃ-স্পৃহা অল্পে অল্পে তাহাদের প্রাণে প্রবল হইয়া উঠিতেছে। হিন্দুর তত্ত্বানু-সন্ধানের ও জ্ঞানের চরম সীমা—বেদান্ত বা কার্য্যের কারণে পরিণতি। সেই পরিণামে উপনীত হইবার সুগম-মার্গ-স্বরূপ রাজযোগ বিস্মৃত হিন্দু-সন্তানকে পুনঃস্মরণ করাইয়া দিবার জন্য আজি এই শুভ-যুগে এই গ্রন্থ সপ্ত বর্ষ পূর্ব্বে—অর্থাৎ বঙ্গীয় বারশত বিরানব্বই সালে প্রথম প্রচারিত হয়। অশেষ আন-ন্দের বিষয় যে ভারতের চতুর্প্রান্ত হইতে ভারত-সন্তানগণ কর্ত্তৃক

তাহা সাদরে ও সাগ্রহে পরিগৃহিত হইয়া স্বল্পকাল মধ্যেই প্রায় নিঃশেষিত হইয়াছিল। এই কয়েক বৎসর মধ্যেই অনেক যুবক ইহার প্রদর্শিত পথ অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রিয়ারম্ভ করিয়া সফলতা লাভ করিতেছেন জানিয়া হৃদয়ের উৎসাহ ও আনন্দ অধিকতর বর্দ্ধিত হইয়াছে। সাধারণ্যে ইহার অভাব অনুমিত হইলেও প্রথমতঃ গ্রন্থকর্ত্তার ঔদাসীন্য, তৎপরে তাঁহার সাংসারিক জীবন হইতে অবসর গ্রহণ ও অবশেষে তাঁহার পশ্চাৎ-তক্ত-সন্তানগণের নানা প্রকার অসুবিধা বশতঃ ইহার পুনর্মুদ্রাঙ্কণের সুযোগ ঘটিয়া উঠে নাই। এক্ষণে মঙ্গলময়ীর অনুগ্রহে সেই সমস্ত বিঘ্নরাশি হইতে কথঞ্চিৎ অবসর প্রাপ্ত হইয়া ইহা পুনর্মুদ্রাঙ্কিত করা হইল। কিন্তু মুদ্রাঙ্কণ আরম্ভ করিয়া অনিবার্য্য-ঘটনা-স্রোতে ভাসমান হইয়া নানা স্থানে গমন করিতে হওয়ায় প্রথম মুদ্রাঙ্কণের ভ্রম সমূহ সম্পূর্ণরূপে সংস্করণের সুযোগ ঘটিল না। এবং চিত্রনী কাষ্ঠ-ফলকে অঙ্কিত করিবার কালে শিল্পকরের অনবধানতা বশতঃ চিত্রপটের মস্তিষ্কের দক্ষিণ ভাগে ১০, ১১ এবং ১২ এই কয়টী সংখ্যা বিপরীত ভাবে অঙ্কিত হওয়ায় তাহাও সংশোধন হইল না। হৃদয়বান্ পাঠকের নিকট এই সামান্য ভ্রম উপেক্ষিত ও শিক্ষিত-ভারত-সন্তানগণ কর্ত্তৃক গ্রন্থ পুনরাদৃত হইলে কৃতার্থ জ্ঞান করিব। ইতি—

কলিকাতা,
মাঘ,
সন ১২৯৯ সাল।

শ্রীঅনিরুদ্ধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়,
প্রকাশক।

প্রথম মুদ্রাঙ্কনের বিজ্ঞাপন।

এই গ্রন্থ প্রচারিত হওনের মূল, আর্য্যধর্ম্মে শ্রদ্ধা। আর্য্য-সন্তানি কৃত-বিদ্য যুবকগণ যে এক্ষণে আর্য্যধর্ম্মে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিতেছেন, ঐশি-তত্ত্ব-সমাজকে (Theosophical society) অনেক স্থলে তাহার মূল বলিতে হইবে। সুতরাং ঐশি-তত্ত্ব-সমাজের প্রবর্ত্তক বা সংস্থাপক মহাত্মাগণ আমাদিগের ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতার ভাজন।

কলিকাতা স্মল্ কজকোর্টের জজ্ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীনাথ রায় রায় বাহাদুর এবং শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষ, শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল মল্লিক ও শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এই সকল মহাত্মা ও সুহৃদগণের অনুরোধ যত্ন ও আনুকুল্যে এই গ্রন্থ অনূদিত, সংস্কৃত, প্রকাশিত ও প্রচারিত হইল। বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বাবু নবগোপাল ঘোষ ও শ্রীযুক্ত বাবু বিহারী লাল মল্লিক মহাত্মাদ্বয়ের অনুরোধে অবতরণিকাটি সংযোজিত হইল।

শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

সর্ব্ব-শক্তিমান সর্ব্বাধার সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বজ্ঞ অচিন্ত্য অনির্ব্বাচ্য নির্ব্বিকল্প দুর্জ্ঞেয় অর্থাৎ মনোবুদ্ধির অতীত অনন্তাত্মা সর্ব্বেশ অবিক্রিয়, সত্য এবং মহিমার নিধান, করুণা এবং ন্যায়ের সাগর, প্রেম এবং আনন্দের প্রভব, শব্দ-স্পর্শ-হীন, আকার-রহিত, কারণ-হীন, অব্যয়, রস-গন্ধ-বর্জ্জিত, অনাদি অনন্ত, দুর্ব্বলের বল, নিরাশ্রয়ের আশ্রয়, নিত্য, অজাত, অক্ষয়, সর্ব্বান্তর্যামী তেজোময় অশরীরী অস্পৃশ্য নির্ম্মল নিষ্পাপ অনন্তচিৎ, মনের নিয়ন্তা, সর্ব্বাতীত, সর্ব্বজীবাধীশ, স্বয়ং প্রকাশ, নিত্য আনন্দ এবং সুখের অনন্ত নিধান, জ্যোতির জ্যোতি, পাতা হর্ত্তা এবং স্রষ্টা, সূক্ষ্ম অবিনাশী মহান, কেবল-সাক্ষী দৃষ্টির অগোচর, অভেদ হ্রাস-বর্জ্জিত, স্বয়ং-ভূ, নির্জ্জীব মনোহীন, জ্যোতির্ম্ময়, অমৃতের সেতু, চন্দ্র সূর্য্য নক্ষত্রের অপ্রকাশ্য, সৎ, স্বয়ং-পাতা, অনন্ত এবং অক্ষয় মঙ্গলের স্বরূপ পরমাত্মাকে, এই গ্রন্থ তাঁহার বিনীত উপাসক সভাপতি স্বামী কর্ত্তৃক সমর্পিত হইল।

বিনীত উপাসক
সভাপতি।

অবতরণিকা।

একক্ষণে ধর্ম্ম লইয়া মানবমণ্ডলী মধ্যে চতুর্দ্দিকে মহা বিষম্বাদ উপস্থিত হইতেছে। কেবল এই কালে উপস্থিত হইতেছে এমত নহে। কাল-প্রবাহে সমাজ-মধ্যে এই রূপ ধর্ম্মের তরঙ্গ নিরতই উঠিয়া থাকে, উচ্চতার চরম সীমায় উপস্থিত হইলে পুনর্ব্বার অবনত হইয়া পড়ে। এই রূপ আবহমান কালই ধর্ম্মের তরঙ্গ বহিতেছে। আর্য্য-ঋষিগণ জ্ঞানের উচ্চতম সীমায় আরোহণ করিয়া যে ব্রহ্ম-জ্ঞান ও রাজ-যোগ মানবের উচ্চতম ধর্ম্ম বলিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা এক্ষণে লুপ্ত-প্রায় হইয়াছে। যেমন লঘু ও অসার দ্রব্যই জল স্রোতে ভাসিয়া যায়, গুরুভার ও সারবান্ দ্রব্য হইলে তাহা স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারে না, মগ্ন হইয়া যায়। সেই রূপ যে সকল জ্ঞান লঘু ও অল্প-সার, তাহাই কাল-স্রোতে ভাসিয়া, কাল হইতে কালান্তরে, ও সমাজ হইতে সমাজান্তরে উপস্থিত হয়। কিন্তু যে সকল জ্ঞান, বুদ্ধির পক্ষে গুরুভার ও অত্যন্ত সারবান্,, তাহা কাল-স্রোতে ভাসিয়া যাইতে পারে না, সুতরাং তলদেশে মগ্ন হইয়া থাকে। বুদ্ধি যে সেই অগাধ জ্ঞান সাগরের তলদেশে মগ্ন হইয়া সেই রত্ন বাছিয়া লইবে, তাহা সকলের ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। এই ব্রহ্ম-জ্ঞান ও তাহা সম্যক্‌রূপে লাভের উপায় যোগ-রূপ কৌশল, বেদান্ত ও অন্যান্য দর্শনে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু তাহার উপদেষ্টা এক্ষণে দুর্ল্লভ। এই গ্রন্থ-কর্ত্তা ব্রহ্ম-

জ্ঞান-গুরু-যোগী পূজ্য-পাদ শ্রীযুক্ত সভাপতি স্বামী মহাশয়, স্বীয় গুরুদেব যোগী-রাজের আদেশানুসারে জন সমাজের হিতার্থ, উত্তর পশ্চিম প্রদেশে উপনীত হইয়া, এই ব্রহ্ম-জ্ঞান ও রাজ-যোগের যেরূপ উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, মিরট নগরের হাই-কোর্টের উকিল ও তত্রত্য ঐশীতত্ত্ব-জ্ঞান সমাজের (Theosophical society) অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত বাবু শ্রীশচন্দ্র বসু মহাশয় সেই উপদেশ গুলি গ্রন্থাকারে প্রচার করেন, এই গ্রন্থ তাহারই বঙ্গানুবাদ। তবে তাহাতে যে সকল ইংরাজী কবিতা আছে, তাহার আভাস মাত্র লইয়া, এই গ্রন্থে বঙ্গ ভাষায় স্বতন্ত্র কবিতা রচনা করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ব্রহ্ম-জ্ঞান ও রাজযোগ সম্বন্ধে এরূপ গ্রন্থ এ পর্য্যন্ত প্রচলিত ভাষায় প্রচারিত হয় নাই। ইহা পাঠ করিলে গুরূপদেশ ব্যতিরেকেও যোগ যে কি তাহা বুঝিতে ও অভ্যাস করিতে পারা যায়।

ব্রহ্ম-জ্ঞানের যে চরম উদ্দেশ্য কি ও রাজ-যোগের অভ্যাস কি রূপে করিতে হয়, তাহাই এই গ্রন্থে পরিষ্কার ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ইহাই যে মানবের উচ্চতম ধর্ম্ম, তদ্বিষয়ে পাঠক-মণ্ডলীর মধ্যে অনেকেরই সংশয় জন্মিতে পারে। তজ্জন্য এই উপক্রমণিকাতে সংক্ষেপে তাহার যথা-সাধ্য মীমাংসা করা হইল। এবং যোগ ও ভক্তি কেনই বা প্রয়োজন, তাহাও প্রদর্শিত হইল। আর্য্য-ঋষিগণ মানবের ঐহিক পারত্রিকের কর্ত্তব্য সমষ্টিকে ধর্ম্ম শব্দে যে কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে ধর্ম্ম শব্দের মৌলিক অর্থ—যাহাতে বা যদ্দ্বারা ধারণ করে। অতএব যাহাতে বা যদ্দ্বারা মনুষ্যত্ব ধারণ করে, অর্থাৎ যে গুণ ও শক্তি থাকিলে মানুষ বলা যায়, তাহাই মানব ধর্ম্ম বলিয়া বুঝিতে

হইবে। এই ভাবে এই অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডে যত কিছু সচেতন বা অচেতন জীব বা পদার্থ আছে, তাহাদিগের সকলেরই বিশেষ বিশেষ ধর্ম্ম আছে। সেই সকল ধর্ম্মই সমষ্টিভাবে মানুষে দেখা যায়। অর্থাৎ সকল প্রকার গুণ ও শক্তি মনুষে প্রতিষ্ঠিত। পাশব জাড্য প্রভৃতি গুণ অপেক্ষা মানব-দেহে যে সকল অতিরিক্ত গুণ ও শক্তি আছে তাহাই মনুষ্যত্ব বা তাহাই মানব ধর্ম্ম। সেই সকল গুণ ও শক্তির বর্দ্ধনেই মানব ধর্ম্মের উন্নতি, এবং তাহাদিগের বশম্বদ হইয়া কার্য্য করিলেই ধর্ম্ম যাজন করা হইল।

পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তানুসারে বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইয়া দেখা যাইতেছে যে, বাহ্য জগৎ ও অন্তর্জ্জগৎ অর্থাৎ মানব-দেহ এই উভয়ের গূঢ় তত্ত্ব সকল অবগত হইয়া ও পরস্পরের সম্বন্ধ বিচার করিয়া স্বীয় কর্ত্তব্য অবধারণের শক্তি কেবল মানবেই নিহিত হইয়াছে। এই প্রকার জ্ঞান-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তি অপর কোন প্রাণীতেই দেখা যায় না। সুতরাং জ্ঞান-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তির প্রাধান্যই মনুষ্যত্ব। এই জ্ঞান-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তির প্রভাবেই আর্য্য-ঋষিগণ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক তত্ত্ব সমূহ অবগত হইয়া বহুবিধ মানব-ধর্ম্ম নির্ণয় করিয়াছেন। এই জন্যই সেই জ্ঞান-নেত্র-দর্শী-মহাত্মাদিগের প্রণীত গ্রন্থ সমুদয়কে শাস্ত্র বলে। শাস্ত্র শব্দের অর্থ যদ্দ্বারা শাসন বা নিয়মিত করে। মানব-সমাজে সকলের বুদ্ধি-শক্তি ও জ্ঞান-শক্তি সমান নহে, এবং সেই জ্ঞান ও বুদ্ধি সমুচিত পথে পরিচালনা করিয়া বাহ্যজগৎ ও আভ্যন্তরিক প্রকৃতির প্রকৃত গুণ ও শক্তি বিচার করা, ও তদনুসারে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া মানব-ধর্ম্ম স্থির করা, সকলের সাধ্যায়ত্তও নহে। বিশেষতঃ যাহাদিগের মন ইন্দ্রিয়-সুখে বা দৈহিক-সুখে আকৃষ্ট,

তাহাদিগের বুদ্ধিও সেই সুখের পক্ষপাতী, সুতরাং মানবের আভ্যন্তরিক বৃত্তি সমূহের দোষ গুণ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিয়া কর্ত্তব্য স্থির করা তাহাদিগের পক্ষে সম্ভবে না। সেই জন্যই ইন্দ্রিয়-সুখ-বিরত জ্ঞান-মাত্রব্রত আর্য্য-তাপসগণ বাহ্য ও আভ্যন্তরিক বিশ্ব-যন্ত্র ও দেহ-যন্ত্রের গুণ ও শক্তি সমূহ জ্ঞান-বলে অবগত হইয়া, জন-সমাজের প্রবৃত্তি ও প্রকৃতি ভেদে ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম প্রণালী নির্ণয় করিয়া, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম-শাস্ত্র সমূহ প্রণয়ন করিয়াছেন। অর্থাৎ জ্ঞান-মার্গ, ধ্যানমার্গ, ভক্তি-মার্গ ও কর্ম্ম-মার্গ এই চারি প্রকার প্রণালী নির্ণয় করিয়া বহুবিধ ধর্ম্ম-শাস্ত্র সকল প্রচার করিয়াছেন। কেবল জন-সমাজের হিত-কামনায় নিঃস্বার্থ ও অভ্রান্ত-ভাবে এই সকল শাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন বলিয়াই তত্তৎকালে লোকেরা তাঁহাদিগের এতাদৃশ গৌরব করিত এবং তাঁহাদিগের উপদেশ-বাক্য সকল শাস্ত্র বলিয়া সমাদরে গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহাদিগকে নিঃস্বার্থ ও অভ্রান্ত বলা অনেকেরই অন্যায় বলিয়া ভ্রম হইতে পারে। কিন্তু নিঃস্বার্থ কেমন করিয়া না বলিব? যাঁহারা ক্ষত্রিয়দিগকে ধনুর্ব্বেদ অধ্যয়ন করাইয়া, যুদ্ধ-কৌশল ও রাজনীতি শিক্ষা দিয়া, রাজ্য-শাসনের উপযোগী করিতেন, আপনারা স্বয়ং সেই রাজ্য-ভোগের বাসনা রাখেন নাই। যাঁহারা সংসারাশ্রমী মানবগণকে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহার্থে অর্থোপার্জ্জনের জন্য আয়ুর্ব্বেদ, জ্যোতির্ব্বিদ্যা, গান্ধর্ব্ব-বেদ, ধনুর্ব্বেদ, স্থাপত্য বেদ * প্রভৃতি অর্থকরী-বিদ্যা সকল শিক্ষা দিতেন, আপনারা কখন সেই সকল বিদ্যার দ্বারা অর্থোপার্জ্জনের

* এই চারিটি উপবেদ। (৬৪) চৌষট্টি কলা স্থাপত্য বেদের অন্তর্গত। ইহার এক একটি কলা এক একটি বিদ্যা, যথা রত্ন

চেষ্টা করেন নাই। নিবিড় অরণ্য যাঁহাদিগের আবাস ভূমি, পর্ণ কুটীর বাস গৃহ, ফল মূল ও যজ্ঞাবশিষ্ট ঘৃত আহার, কৌপীন, অজীন বা কৌশেয় পরিধান, গৃহ-দ্রব্যের মধ্যে কমণ্ডলু, ধনের মধ্যে গ্রন্থ সমূহ, এবং জ্ঞানের আলোচনাই যাঁহাদিগের জীবনের একমাত্র অবলম্বন। সেই সকল জন-হিতৈষী মহাত্মাগণকে, সেই সকল ঐশ্বর্য্য-ভোগ-বিরাগী যোগীগণকে যদি নিঃস্বার্থ না বলি—তবে আর কাহাকে বলিব? তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত কেন বলি, তদ্বিষয়ের মীমাংসা পরে করা যাইবে। এক্ষণে আর্য্য ঋষিগণ জ্ঞান-শক্তি ও বুদ্ধি-শক্তি যেরূপে পরিচালিত করিয়া আপনারা ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ করিয়াছেন এবং জ্ঞানের সেই উচ্চতম শিখরে আরোহণ করিয়া অধঃস্থিত মানবের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য স্থির করিয়াছেন, তাহাই বিবেচনা করা যাইতেছে।

জ্ঞানযোগ—জ্ঞান শব্দের অর্থ জানা। এই সংসার মধ্যে জ্ঞাতব্য যাঁহারা জানেন দর্শন-শাস্ত্রে তাঁহাদিগকে তত্ত্বজ্ঞানী বলে। সৃষ্টিতত্ত্বই তাঁহাদিগের জ্ঞাতব্য। সৃষ্টিতত্ত্ব দুই প্রকার, বাহ্য-জগৎ বা বিরাট্-দেহ, অন্তর্জগৎ বা মানব-দেহ। অর্থাৎ জগৎ কি? ও আমি কি? এই দুইটী তত্ত্ব-জ্ঞানীদিগের জ্ঞাতব্য। কস্মাৎ কোঽহং কিমপিচ ভবান্ কোঽয় মন্যঃ প্রপঞ্চ ইত্যাদি বাক্যের দ্বারা জ্ঞাতব্য যে কি তাহা অনেক স্থলে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রথমতঃ বাহ্য-জগৎ কি তৎসম্বন্ধে বিচার করা যাইতেছে। আর্য্যদিগের দর্শনশাস্ত্র সমূহে একই মত ভিন্ন ভিন্ন রূপে

পরীক্ষণ, আকর জ্ঞান, আলেখ্য-বিদ্যা, বৃক্ষায়ুর্ব্বেদ যোগ, বাস্তু বিদ্যা, ধাতু-বাদ ইত্যাদি বিদ্যার দ্বারা পুরাকালে আর্য্য গৃহস্থেরা অর্থোপার্জ্জন করিতেন।

প্রকাশিত হইয়াছে। দ্রব্য গুণ ও ক্রিয়া দ্বারাই যে সমুদয় সৃষ্টি ইহা সকলেই স্বীকার করেন, এবং তত্ত্ব-জ্ঞানী যোদিগেরও এইরূপ উপদেশ। ইহাদিগের মধ্যে দ্রব্যতত্ত্ব নিত্য, অর্থাৎ যাহার কখন অভাব হয় না তাহাই দ্রব্য। গুণ সেই দ্রব্যে লীন হইয়া থাকে, যখন তাহা হইতে প্রকাশ পায় তখনই তাহাতে ক্রিয়া-শক্তির আবির্ভাব হয়। দ্রব্য একমাত্র, বুদ্ধির অতীত, অনন্ত অবকাশ-মধ্যে অপরিচ্ছিন্ন ভাবে অবস্থিত। গুণ তিন প্রকার সত্ব, রজঃ এবং তমঃ। ইহাদিগের দ্বারা শক্তি চালিত হয়। শক্তির দুই প্রকার গতি—প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। গুণ-শক্তির প্রভাবে প্রবৃত্তি-বেগ প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হইলে, আবরণ বিক্ষেপ এই দুই প্রকার ক্রিয়াশক্তি সমুদ্ভূত হয়। গুণ-শক্তি, দ্রব্যের নিত্য সত্তায় সত্তবতী হইয়া এবং আভ্যন্তরিক গুণের দ্বারা চালিত হইয়া এই দুই ক্রিয়া শক্তি সহকারে ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া সম্পাদনার্থে বহুবিধ আকারে পরিণত হইয়াছে। সেই সকল শক্তির দ্বারা স্থূল সূক্ষ্ম অনন্ত আকার বিশিষ্ট এই বিশ্ব সংসারে সৃজন পোষণ পরিবর্ত্তন প্রভৃতি সকল ক্রিয়া সম্পাদিত হইতেছে। শক্তির বেগ-প্রভাবে নিঃসৃত পরমাণু সকল একদিকে আবরণ শক্তির দ্বারা সংশ্লিষ্ট হইয়া রূপ বা আকার ধারণ করিতেছে। অপর দিকে বিক্ষেপ শক্তির প্রভাবে পরমাণু সকল বিশ্লিষ্ট হইয়া রূপান্তরে পরিণত হইতেছে। তাহারা পুনর্ব্বার নূতন ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া অন্য পদার্থের আকারে প্রকাশ পাইতেছে। সুতরাং এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে আমরা যাহা কিছু পদার্থ বলিয়া দেখিতেছি তাহা কেবল গুণ ও শক্তির রচিত আকার মাত্র। কিন্তু এই রূপ

গুণ-শক্তির প্রভাবে যে দ্রব্য নিয়তই রূপ হইতে রূপান্তরে প্রতিভাত হইতেছে, সেই দ্রব্যের স্বরূপ কি তাহা আমরা কিছুই বুঝিতে পারি না। গুণ-শক্তির প্রভাবে দ্রব্যের প্রকৃত ভাব সমাচ্ছাদিত রহিয়াছে, তাহার বিকৃত ভাবই কেবল আমাদিগের উপলব্ধি হইতেছে। অতএব তত্ত্ব-জ্ঞানীগণ এইরূপ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে গুণ-শক্তির নিঃশেষে বিরাম হইলে যাহা-কিছু অবশিষ্ট থাকে তাহাই নিত্য বস্তু। যদি এরূপ অনুমান করা যায় যে গুণ-শক্তির নিঃশেষে বিরাম হইলে পরমাণু মাত্র অবশিষ্ট থাকে, এইটি বিজ্ঞান সঙ্গত হয় না। কারণ, পরমাণু সকল পরস্পরের আকর্ষণে অবস্থিত, সুতরাং সে অবস্থাতেও ক্রিয়া-শক্তির বিদ্যমানতা থাকে। এই জন্য তত্ত্ব-জ্ঞানীগণ বলেন যে গুণশক্তির বিরামে পরমাণু পর্য্যন্তও দ্রবীভূত হইয়া অবশেষে গুণশক্তির অতীত অথচ গুণ-শক্তির আশ্রয় স্বরূপ একমাত্র নিত্য বস্তু অপরিচ্ছিন্ন ভাবে অবশিষ্ট থাকেন, তিনিই ব্রহ্ম নামে অভিহিত। বাহ্য জগতের বিচার করিয়া সেই নিত্য বস্তুর কেবল পরোক্ষ জ্ঞানই লাভ করা যায়—অপরোক্ষ বা প্রত্যক্ষ-জ্ঞান লাভ করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ অন্তর্জগৎ বা আমি কি—তদ্বিষয়ের বিবেচনা করা যাইতেছে। মানব-দেহ একটি যন্ত্র মাত্র। ভৌতিক-তত্ত্ব, শক্তি-তত্ত্ব ও জ্ঞান-তত্ত্ব, এই তিন প্রকার তত্ত্বে নির্ম্মিত। ক্রিয়া-শক্তি-প্রধান অবয়ব বিশিষ্ট স্থূলদেহ ভৌতিক তত্ত্বে নির্ম্মিত, ইচ্ছা-শক্তি-প্রধান সূক্ষ্ম দেহ, শক্তি-তত্ত্বে নির্ম্মিত। এবং জ্ঞান-শক্তি-প্রধান সংস্কারের আধার স্থূল সূক্ষ্ম উভয় শরীরের বীজ কারণ-দেহ, জ্ঞান-তত্ত্বে নির্ম্মিত। আত্ম-তত্ত্ব

জ্ঞানী যোগীগণ নির্ণয় করিয়াছেন যে, যে কিছু শক্তি বা গুণ ব্রহ্মাণ্ডে আছে, সেই সমস্তই মানব শরীরে নিহিত হইয়াছে। "ব্রহ্মাণ্ডে যে গুণাঃ সর্ব্বে শরীরেষু ব্যবস্থিতাঃ" এইরূপ বাক্য আর্য্য শাস্ত্রের অনেক স্থানে দেখা যায়। আধুনিক তত্ত্ব-জ্ঞানী গণের মধ্যে অনেকেই বলেন "Internal is the typical of the external" অর্থাৎ অন্তর্জ্জগৎ বাহ্য জগতেরই অনুকরণ। যুক্তিও ইহা প্রতিপন্ন করিতেছে। অন্নরূপ জগৎ পদার্থ হইতে শুক্র শোণিতের উৎপত্তি। শুক্র শোণিত হইতেই দেহ। আহার-জাত-রসের স্বরূপ জগৎ পদার্থের দ্বারাই মানব যন্ত্রের স্থূল দেহ ও ক্রিয়া শক্তি সকলের পোষণ হইতেছে। জগতের নিয়মের অধীনেই এই দেহের স্থিতি। ইহার জ্ঞান-শক্তি সমস্ত অন্তরে আছে এই মাত্র, দেহের অভ্যন্তরের তাহারা কিছুই জানে না, জগৎ পদার্থেই তাহারা একান্ত গ্রথিত। অর্থাৎ জগৎ-পদার্থের জ্ঞানেই জ্ঞান-শক্তিরও পোষণ হইতেছে। ধ্বংস হইলে দেহ পদার্থ সমূহ জগতেই মিলিত হয়। অতএব এই জগৎই দেহের জনক, পালক এবং আশ্রয়। আমাদিগের শারীরিক বা মানসিক প্রকৃতির যাহা কিছু প্রয়োজন তাহা সমস্তই জগতে আছে। যাহা জগতে নাই, এমন অভাব আমাদিগের কখন অনুভূত হয় না। জনকের গুণ জন্য পদার্থে বর্ত্তান যদি প্রকৃতির নিয়ম থাকে, তবে এই দেহ-যন্ত্র অবশ্যই বাহ্যজগতের অনুকরণ বলিতে হইবে। তবে উভয়ের গুণ ও শক্তি সকল আমরা যদি ঐক্য করিয়া বুঝিতে না পারি, তাহা আমাদিগের বুদ্ধির দোষ। এই নিমিত্ত আর্য্য-জ্ঞানীগণ এই দেহকে ক্ষুদ্র ব্রহ্মাণ্ড বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই নিমিত্তই দেহ-যন্ত্রকে অন্তর্জ্জগৎ বলা যায়।
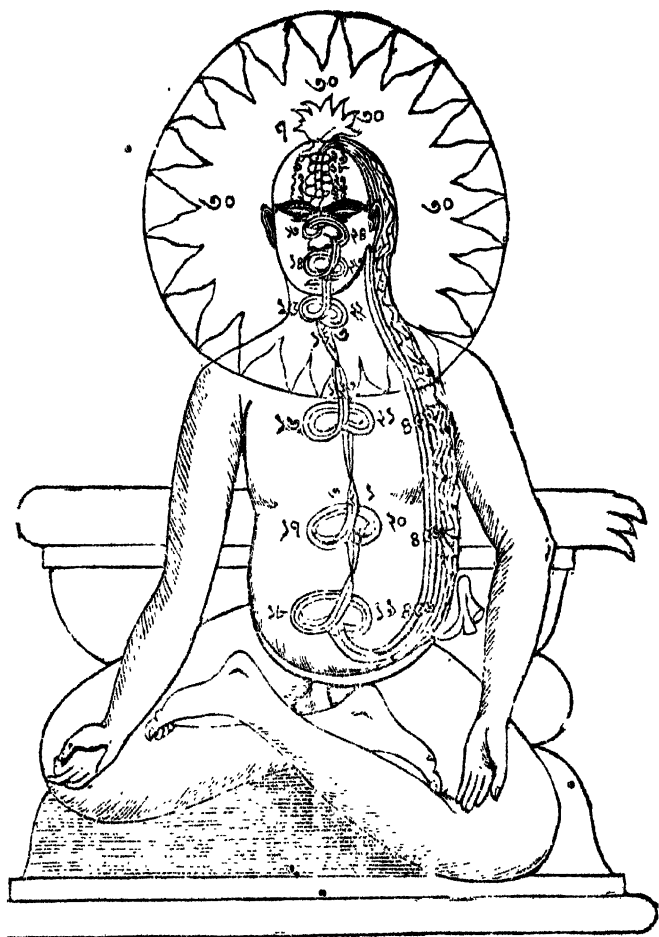
এই দেহ-যন্ত্রের স্থূলভাগ ও সূক্ষ্মভাগ অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীরে, জ্ঞান একমাত্র অধিষ্ঠাতা। 'আমি' একটি ভাব মাত্র জ্ঞানে প্রকাশ পায়। দেহের জাগ্রদাবস্থায়, কেশাগ্র হইতে নখাগ্র পর্য্যন্ত জ্ঞান সর্ব্ব শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে, সেই কালে অহংভাবও জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীর ব্যাপিয়া অবস্থিতি করে। স্বপ্নাবস্থায় যখন জ্ঞান স্থূল-দেহ হইতে আকৃষ্ট হইয়া ক্রিয়া-শক্তিময় ও জ্ঞান-শক্তিময় সূক্ষ্ম শরীরে অবস্থিতি করে, তৎকালে সেই মনোময় সূক্ষ্ম শরীরে অহংভাব প্রবল হইয়া থাকে। গভীর নিঃস্বপ্ন-নিদ্রাকালে, যৎকালে জ্ঞান, স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর পরিত্যাগ করিয়া, নিশ্চেষ্ট ভাবে কারণ শরীরে অবস্থিতি করে, * তৎকালে অহংভাবও এক কালে ক্ষীণ হইয়া জ্ঞানেই লীন হইয়া থাকে। কারণ, জাগ্রত হইয়া উঠিবা মাত্র তৎক্ষণাৎ স্মরণ হইতেছে যে আমি ঘোরতর নিঃস্বপ্নে নিদ্রিত ছিলাম। এই অবস্থা স্মরণ হওয়াতে, স্মৃতির নিয়মানুসারে সিদ্ধান্ত করা যায় যে, সেই নিঃস্বপ্ন অবস্থা জ্ঞানের দ্বারা তৎকালে প্রত্যক্ষ করা হইয়াছিল বলিয়া পরে স্মরণ হইতেছে। এইরূপে জ্ঞান তিন দেহে আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে। বুদ্ধি, স্মৃতি, চিত্ত, অহংজ্ঞান ইহাদিগের সমষ্টিকে অন্তঃকরণ-যন্ত্র বলা যায়। এবং চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ ইহাদিগকে জ্ঞানেন্দ্রিয়-যন্ত্র বলে। জ্ঞান, যখন অন্তকরণ-যন্ত্রে অবস্থিত হইয়া একাগ্রভাবে চিন্তা করিতে থাকে, তখন জ্ঞানেন্দ্রিয়-যন্ত্র সত্ত্বেও বাহ্য পদার্থ জ্ঞানেতে প্রকাশ পায় না, অথব-প্রকাশ-ভাবের হ্রাস হয়। যখন জ্ঞানেন্দ্রিয়-যন্ত্রের দ্বারা বাহ্য

---

* অভ্যাস-জনিত সংস্কার ও স্মৃতি যন্ত্রকে কারণ-শরীর বলে।

জগতে একাগ্রভাবে সংযোজিত হয়, তখন অন্তঃকরণ-যন্ত্রের ক্রিয়া প্রকাশ পায় না, অথবা তাহার ক্রিয়া-শক্তি হ্রাস হইয়া যায়। অতএব জ্ঞান অন্তঃকরণ-যন্ত্রের ও বাহ্য-জ্ঞানেন্দ্রিয়-যন্ত্রের মধ্যে যন্ত্রিত বা বদ্ধ থাকিয়া আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে। ক্রিয়া পুনঃ পুনঃ করিলে, অভ্যাস-জনিত একটি সংস্কার জন্মে, সেই সংস্কার-সঞ্চিত ব্যাপারই স্মৃতি পথে অধিকাংশ সময়ে উদয় হয়—সেই ব্যাপার-ঘটিত পদার্থ ও ক্রিয়া সমূহই চিন্তারূপে জ্ঞানে প্রকাশ পায়—সুতরাং জ্ঞান প্রকৃতি-যন্ত্রে যন্ত্রিত। যন্ত্রিত হইয়া আকুঞ্চিত ও প্রসারিত হইতেছে বলিয়া জ্ঞানকে দ্রব্য বলা যায়। জ্ঞানেন্দ্রিয়-যন্ত্রগণ জ্ঞানের অধিষ্ঠান ব্যতিরেকে বাহ্য-জগৎ প্রকাশ করিতে পারে না। কিন্তু জ্ঞান, ইন্দ্রিয়-যন্ত্রের সহায়তা ব্যতিরেকেও শ্রবণ, স্পর্শন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়-ক্রিয়া ও তাহার ব্যাপ্য শব্দ স্পর্শ-রূপ রস গন্ধের স্বরূপ জগৎ পদার্থ, উভয়কেই প্রকাশ করিতেছে। জগৎ পদার্থ যদি দৃষ্টির বিষয় হয়, তাহা হইলে 'যেন দেখিতেছি' অর্থাৎ দর্শন ক্রিয়া ও দৃশ্য বস্তু উভয়ভাব প্রকাশ পায়; যদি শ্রব-ণের বিষয় হয়, তবে 'যেন শুনিতেছি' অর্থাৎ শ্রবণ-ক্রিয়ার ভাব ও শব্দ উভয়ই জ্ঞানে প্রকাশ পায়। এই স্থানে জ্ঞান শ্রবণ-ক্রিয়ার ভাব ধারণ করিলে তাহাতে দর্শন-ক্রিয়ার ভাব প্রকাশ পায় না, এবং অন্য ইন্দ্রিয়-ক্রিয়ার ভাব সম্বন্ধেও সেই রূপ *। অতএব জ্ঞান ইন্দ্রিয়-যন্ত্রে যন্ত্রিত। ক্রিয়ার ভাব ও ক্রিয়ার ব্যাপ্য বিষয়

---

* এ স্থলে এইটি অনুমান করিতে হইবে যে জ্ঞান কোন বিষয়ে একান্ত একাগ্রীভূত হইলে বিষয়ান্তরের উপলব্ধি হয় না। একাগ্রভাবের তারতম্য অনুসারে বিষয়ান্তরের উপলব্ধির তার-তম্য হইয়া থাকে।

অর্থাৎ কর্ম্ম, এই উভয় ভাব জ্ঞানে প্রকাশ পাইলে, প্রকৃতির নিয়মানুসারে এই প্রকাশ করা ক্রিয়াতে কর্ত্তৃ-ভাব প্রকাশ হওয়া প্রয়োজন হইতেছে। তাহাতে ঐ উভয়ের প্রকাশক জ্ঞান স্বয়ং কর্ত্তা রূপে প্রকাশ পাইল। এস্থলে যন্ত্রিত জ্ঞানের দুই শক্তি প্রকাশ পাইতেছে—প্রকাশ করা ও স্বয়ং প্রকাশ হওয়া। রাগ, দ্বেষ, ভয়, লজ্জা, শোক, মোহ, সুখ, দুঃখ, ভক্তি, আনন্দ ও প্রেম এই সকল ভাব দ্বারা অন্তঃকরণ চালিত হয়। এই সকল ভাব, বাহ্য কারণের সংযোগ না থাকিলেও জ্ঞানে প্রকাশ পায়, এবং সকল ভাব এককালে প্রকাশ পায় না। অতএব সেই সকল ভাব গুণের দ্বারা পরিচালিত হইয়া অন্তঃকরণে উদয় হয়। গুণ তিন প্রকার—সত্ত্ব রজঃ তমঃ। যখন যে গুণ প্রবল হয়, সেই মত ভাব অন্তরে উদয় হয়। এই তিন গুণের দ্বারা জ্ঞান যন্ত্রিত। সুতরাং জ্ঞানে গুণ ও শক্তি উভয়েরই প্রভাব লক্ষিত হয়। সেই সকল গুণ ও শক্তি দেহ যন্ত্রের প্রকৃতিগত। দেহ যন্ত্রের প্রকৃতি অনুসারে গুণ ও শক্তি সমূহের ভেদ দেখা যায়। সেই সকল প্রকৃতি গত গুণ শক্তির দ্বারা দেহ-যন্ত্রে যন্ত্রিত হইলে, জ্ঞান সংযত ও সঙ্কুচিত হইয়া অহংভাবে প্রকাশ পায়, প্রত্যেক দেহ-যন্ত্রের ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতিগত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার গুণ শক্তির দ্বারা যন্ত্রিত বলিয়া, একমাত্র অহংভাব প্রত্যেক দেহে ভিন্ন ভিন্ন রূপে প্রকাশ পাইতেছে। এবং দেহ ব্যতিরিক্ত পদার্থে ভিন্ন বা পরভাব এবং দেহে আত্মভাব জন্মাইতেছে। এই জন্যই সিদ্ধান্ত করা যায় যে 'আমি' বলিতে কোন বিশেষ পদার্থ লক্ষিত হয় না। এইটি একটি ভাব মাত্র। গুণ-শক্তির দ্বারা জ্ঞান এই দেহ-যন্ত্রে যন্ত্রিত হই-

সেই এই ভাব প্রকাশ পায়, এবং জ্ঞানের সঙ্গে অবস্থান্তরিত হয়। সুতরাং গুণ-শক্তি বিশিষ্ট জ্ঞানই দেহের অধিষ্ঠাতা, তাঁহাকেই তত্ত্ব-জ্ঞানীগণ জীব বা আত্মা বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এই জ্ঞানই প্রকৃত অহং বা 'আমি'।

ধ্যানযোগ—পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত হইয়াছে জগৎ-পদার্থ বা জীব-দেহ গুণ-শক্তির প্রকাশিত বিকার মাত্র। আমরা যাহা কিছু দেখিতেছি সমস্তই বিকৃত ভাব। জগতের প্রকৃত অবস্থা বা ভাব কি তাহা গুণ-শক্তির বিরাম না হইলে জানা যায় না। জানিবার উপায় জ্ঞান। সেই জ্ঞান স্বয়ং প্রকাশ এবং অন্যের প্রকাশক হইয়াও গুণ-শক্তির দ্বারা এরূপে যন্ত্রিত, যে বাহ্য-জগতের গুণ-শক্তিময় বিকৃত আকার ধরিয়াই ইহা নিরন্তর অবস্থিতি করিতেছে। জগৎ-আকার পরিত্যাগ পূর্ব্বক স্বয়ং-প্রকাশভাবে কখনই অবস্থিতি করিতে পারে না। জ্ঞানের সংযোগ ব্যতিরেকে দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ স্ব স্ব বিষয় প্রকাশ করিতে সমর্থ হয় না। কিন্তু ইন্দ্রিয়-গৃহীত বিষয় সকল, ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ ব্যতিরেকেও জ্ঞান আপনাতে প্রকাশ করিতে সমর্থ। সুতরাং ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় প্রকাশ করিবার শক্তি জ্ঞানেতেই নিহিত। এই প্রকার শক্তি সত্ত্বেও ইহা আভ্যন্তরিক বিষয় বা অবস্থা প্রকাশ করিতে পারে না। ইহা গুণ-শক্তির দ্বারা এরূপ যন্ত্রিত যে দেহের অভ্যন্তরে থাকিয়াও, জগচ্চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের নিমিত্তও অভ্যন্তরে স্থির থাকিতে পারে না। সুতরাং আভ্যন্তরিক প্রকৃত ভাব প্রকাশ করিতেও সমর্থ হয় না।

শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ গ্রহণ করিয়াই জ্ঞান জগৎ-পদার্থ সমস্ত অবগত হইতেছে। পদার্থ সম্বন্ধে জ্ঞান এই পাঁচটির

অতিরিক্ত আর কিছুই নাই। কিন্তু এই পঞ্চ ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয় গুণ-শক্তির দ্বারা রচিত। জ্ঞানও স্বয়ং গুণ-শক্তির দ্বারা যন্ত্রিত, গুণ-শক্তির রচিত বিষয়ই গ্রহণ করিয়া থাকে। গুণ-শক্তির বিরাম হইলে পদার্থের যে প্রকৃত ভাব প্রকাশ পায়, তাহা গুণ-শক্তি-বিশিষ্ট জ্ঞানের ধারণা করিবার সামর্থ্য নাই; গুণ-শক্তি-যুক্ত অবস্থার জ্ঞান, গুণ-শক্তি বিরামের অবস্থাপন্ন দ্রব্যের প্রকৃত ভাব অনুভব করিতে পারিবে না। নিউটনের মন যেরূপ ভাবে ভাবিত হইয়া বা যেরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া আহারাদি জগদ্ব্যাপার বিস্মৃত হইত, আহার-লোলুপ ভোগ মাত্র অভিলাষী চিন্তাহীন ব্যক্তির মনে তাহা অনুভূত হওয়া কথনই সম্ভবে না। সেই ভাব বা অবস্থা অনুভব করা কেবল সেইরূপ অবস্থাপন্ন চিত্তেরই সম্ভবে। অতএব গুণ-শক্তির বিরামে যে দ্রব্য, ভাব বা অবস্থা প্রকাশ পায়, তাহা গুণ-শক্তি-যুক্ত জ্ঞানের দ্বারা প্রকাশ পাইতে পারে না। তাহা জানিতে হইলে জ্ঞানেরও গুণ-শক্তি বর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন। জ্ঞানের শক্তি—চিন্তা। চিত্ত-বৃত্তিকেও চিন্তা বলে। চিত্ত, জ্ঞানের একটি অবস্থা বিশেষ। সুতরাং চিন্তা বা চিত্ত-বৃত্তিকে নিঃশেষে বর্জ্জিত করিতে পারিলেই জ্ঞান, শক্তি-বর্জ্জিত হইল। এই চিন্তা বৃত্তি বা চিত্ত-বৃত্তির বর্জ্জনকেই তত্ত্ব-জ্ঞানীরা যোগ বলেন। "সর্ব্ব চিন্তা পরিত্যাগান্নিশ্চিন্তো যোগ উচ্যতে।" গ্রন্থান্তরে "যোগশ্চিত্ত-বৃত্তি নিরোধঃ" পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে ক্রোধ, মোহ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি অন্তঃকরণের ভাব সমস্ত জ্ঞান-শক্তির বা চিন্তার পরিচালক; এবং ভাব সমূহের পরিচালক, গুণ॥ শম, দম, উপরতি, তিতিক্ষা, সমাধান এই কয়েকটি যোগাঙ্গ

অভ্যাসেই অন্তঃকরণের ভাব সমস্ত তিরোহিত হয়। ভাব সমস্ত তিরোহিত হইলে, অভ্যাসের বলে গুণেরও প্রভাব তিরোহিত হইয়া যায়। গুণ-শক্তির প্রভাব রহিতের কৌশল স্বরূপ রাজযোগ, প্রয়োজনীয় যোগাঙ্গ সমেত এই গ্রন্থে বিশেষ রূপে বর্ণিত হইয়াছে। এই যোগাভ্যাসের চরম ফল সমাধি। যোগ অভ্যস্ত হইলে, গুণ-শক্তির নিঃশেষে বিরামাবস্থায় যে কেবল মাত্র চেতনময় দ্রব্য, অবস্থা বা ভাব অবশিষ্ট থাকে, জ্ঞান সেই আকারে আকারিত হয়। ইহাই বৌদ্ধদিগের শূন্য। জড়-শক্তিবাদীদিগের দ্রব্য ও শক্তির মিলিত অবস্থা। ইহা যন্ত্রিত-জ্ঞান ও বুদ্ধির অতীত, তত্ত্ব-জ্ঞানী যোগীগণ মধ্যে পরমাত্মা বলিয়া প্রতিষ্ঠিত। তৎকালে সেই জ্ঞান আর দেহ মধ্যে অহংভাবে যন্ত্রিত থাকে না, অনন্ত বিশ্ব পদার্থের অন্তরে ও বাহ্যে অপরিচ্ছিন্ন স্বয়ং-প্রকাশ ভাবে ব্যাপ্ত হয়। সেই অবস্থা, এইরূপ অহংভাব-যুক্ত জীব অবস্থায় থাকিয়া অনুভব করা যায় না। মানব-যন্ত্রের উচ্চতম জ্ঞান ও বুদ্ধির এই চরম সীমা। এই সীমায় উপনীত হইলে ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে কিছুই অবিদিত থাকে না। আর্য্য-ঋষিগণ জ্ঞানের এই চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিলেন বলিয়াই তাঁহাদিগকে অভ্রান্ত বলি। প্রকৃতির উচ্চতম সৃষ্টি মানব এই সীমায় উপনীত হইলে, তাহার মানব নাম সার্থক হয়;—ইহা লাভ হইলে ধর্ম্ম অর্থ, কাম, মোক্ষ সকলই লাভ হইয়া থাকে।

ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থি শ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে।

যং লব্ধাচাপরং লাভং মন্যতেনাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতোন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে।

ভক্তিযোগ—এক্ষণে ভক্তি-যোগ ও তাহার প্রায়াজন কি তদ্বিষয়ের বিচার করা যাইতেছে। জগৎকে বিরাট-দেহ বা বিরাট-যন্ত্র বলা যায়, মানব-দেহ বা মানব-যন্ত্র তাহার অনুকরণ। পূর্ব্বে সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে, যে সকল গুণ-শক্তির দ্বারা এবং যে ক্রিয়াপ্রণালীতে বিরাট-দেহের ক্রিয়া সম্পাদিত হয়, সেইরূপ গুণ-শক্তির দ্বারা ও সেইরূপ ক্রিয়া প্রণালীতে মানব দেহেরও ক্রিয়া সম্পাদিত হয়। সুতরাং একটির ভাব বুঝিতে পারিলে অপরটির ভাব বুঝিতে পারা যায়। বিরাট-দেহের সহিত তুলনায় মানব দেহ যেরূপ ক্ষুদ্র বলিয়া বোধ হয়, অনন্ত অবকাশে অপরিচ্ছিন্ন ভাবে ব্যাপ্ত ব্রহ্ম-তত্ত্বের সহিত তুলনায় বিশাল বিরাট-দেহও সেইরূপ, কিন্তু সে তুলনার অনুভূতি শক্তি মানব-বুদ্ধিতে স্পষ্টরূপে প্রকাশ পায় না। মানব-যন্ত্রের অধিষ্ঠাতা জ্ঞান যেরূপ এই দেহে জীব বা অহং বা আত্মা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন, এই বিরাট-যন্ত্রের অধিষ্ঠাতা জ্ঞানও সেইরূপ ঈশ্বর, বিরাট-আত্মা বা হিরণ্য-গর্ভ বা বিরাট পুরুষ বলিয়া আর্য্য-দর্শন-শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছেন। জাগ্রদাবস্থায় মানব-যন্ত্রের অধিষ্ঠাতা জ্ঞান, প্রকৃতিগত শক্তির প্রভাবে সর্ব্ব দেহে প্রসারিত হইয়া, আনখাগ্র দেহকে সচেতন ভাবে প্রকাশ করে। সেই রূপ বিরাটের জাগ্রদাবস্থায় অর্থাৎ সৃষ্টি প্রকাশ কালে, বিরাটের অধিষ্ঠাতা জ্ঞান স্বীয় প্রাকৃতিক-শক্তি প্রভাবে এই বিরাট-দেহ সচেতন ভাবে প্রকাশ করে। মানব দেহের নিদ্রাকালে যেমন সমস্ত ক্রিয়া-শক্তি

নিশ্চেষ্ট ভাবে স্বীয় প্রকৃতিতে লীন হইয়া থাকে, (তবে স্থূল দেহ বাহ্য জগতের নিয়মের অধীন বলিয়া সম্যক্ লয় হয় না), সেইরূপ বিরাট পুরুষের নিদ্রাবস্থায় সমস্ত ক্রিয়া-শক্তি স্বীয় প্রকৃতিতে লয় হইয়া থাকে *। জ্ঞানময় বিরাট পুরুষের জাগ্রদাবস্থায়, ক্রিয়াশক্তির সমষ্টি প্রকৃতি উত্তেজিত হইলে এই সৃষ্টি প্রকাশ পায়। এবং নিদ্রাবস্থায় ক্রিয়া-শক্তি সমস্ত নিশ্চেষ্ট ভাবে প্রকৃতিতে লীন হইলে এই সৃষ্টিও সেই প্রকৃতিতে লয় পায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে শক্তির দুই প্রকার গতি, প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তি। আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা ইহাকে সঙ্কোচ ও প্রসারণ (Contraction and expansion) বলিয়া থাকেন।

সুষুপ্তিকালে দেহ-যন্ত্রে যন্ত্রিত জীব-চেতন নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকে। জাগ্রদাবস্থার প্রারম্ভেই সেই চেতন সংযত হইয়া অপরিস্ফুট রূপে অহংভাবে পরিণত হয়। নিশ্চেষ্ট চেতনে অহংজ্ঞান প্রকাশ পাইবামাত্র তাহাতে স্মৃতি-শক্তির উদয় হয়। স্মৃতির উদয়ে জ্ঞান উজ্জ্বলীভূত হইয়া, স্মৃতির বিষয়ীভূত পদার্থ সকলের আকার প্রকাশ করিবার জন্য

---

* নিম্নলিখিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার কয়েকটি শ্লোকে এই ভাব স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইয়াছে। যথা—

অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্ত সংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ সএবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎস্বু ন বিনশ্যতি॥

প্রসারিত হইতে থাকে। এইরূপে স্মৃতি কর্ত্তৃক প্রসারিত জ্ঞানই অন্তরে স্থানরূপে (Conception of Space) প্রকাশ পায়। সেই প্রসারণ-শক্তির নিরবচ্ছিন্ন গতি-প্রবাহ অন্তরে কাল বলিয়া অনুভূত (Conception of time) হয় *। কারণ কাল অনুভবের বিষয়, এবং ক্রিয়াই কালের অনুভাবক। স্মৃত পদার্থ প্রকাশ পাইলেই জ্ঞানে বাসনার উদয় হয়। বাসনা সহকারে জ্ঞানের ক্রিয়াভিমুখী যে গতি তাহাকে ইচ্ছা বলে। জ্ঞানের সেই ইচ্ছারূপী গতি-শক্তির দ্বারা দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়া সমস্ত সম্পাদিত হয়। সেই রূপ বিরাট-যন্ত্রে যন্ত্রিত ঈশ্বর চেতন সুষুপ্তি অর্থাৎ প্রলয়ে নিশ্চেষ্ট ভাবে থাকেন। সুষুপ্তি ভঙ্গে বিরাটের প্রকৃতি-যন্ত্র উত্তেজিত হইলে বিরাট-চেতন ঘনীভূত হইয়া অহং জ্ঞান প্রকাশ পায়। প্রকৃতি-যন্ত্রে অহং জ্ঞান প্রকাশ হইবামাত্র, সেই অহং-জ্ঞানরূপ গর্ভে জগতের অঙ্কুর-রূপিণী স্মৃতির উদয় হয়। স্মৃতির উদয়ে জ্ঞান স্বভাবতই উজ্জ্বলীভূত হয়। স্মৃতির বিষয়ীভূত পদার্থ সকলের আকার প্রকাশ করিবার কারণ সেই জ্ঞান মণ্ডলাকারে প্রসারিত হয়। সেই মণ্ডলাকারে প্রসারিত জ্ঞান বিরাট দেহ অথবা

---

* এই সম্বন্ধে MR. Kant মহাশয়ের অনুভূতিতে কতকটা এই ভাবের উদয় হইয়াছে। তিনি বলেন Time and space are a "prior laws or condtions of the conscious mind." MR. Spencer বলেন "Our conception of space (and time) are produced by some mode of the unknowable; complete unchangeableness of our conception of it, simply implies a complete uniformity in the effect, wrought by this mode of the unknowable upon us"

বাহ্যস্থিতে অবকাশ রূপে (Space) প্রকাশ পায়। স্থিতি রূপা সেই প্রসারণ শক্তির নিরবচ্ছিন্ন গতি প্রবাহ হইতে কাল (Time) প্রকাশ পায়। * স্মৃতির গর্ভে জগতের অঙ্কুর প্রকাশ হইবামাত্র বাসনা, সঙ্কল্প বা আকাঙ্ক্ষার উদয় হয়। সেই বাসনা শক্তি উত্তেজিত হইলে যে গতি জন্মে তাহাকে ইচ্ছা বলে। সেই সঙ্কল্প বা বাসনার প্রভাবে কোটি কোটি প্রকার ইচ্ছা-রূপিণী শক্তি প্রাদুর্ভূত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের অবকাশ (Space) মধ্যে সৃজন, পোষণ, ধারণ এবং পরিবর্ত্তিত করণ প্রভৃতি ক্রিয়ার দ্বারা এই বিশ্ব-সংসারের ব্যাপার সমস্ত সম্পাদন করিতেছে। সেই সকল শক্তি আর্য্যশাস্ত্রে দেবতা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। মানব-যন্ত্র সুষুপ্তি অবস্থা হইতে জাগ্রদা-বস্থায় পরিণত হওয়া পর্য্যন্ত, জীব-চেতনে যে সকল অবস্থা ও ক্রিয়া-শক্তি প্রকাশ পায়, এবং বিরাট-যন্ত্রের সুষুপ্তি হইতে জাগ্রদাবস্থা অর্থাৎ সৃষ্টি প্রকাশ পর্য্যন্ত বিরাট-চেতনে যে সকল অবস্থা ও ক্রিয়াশক্তি প্রকাশ পায়, এই দুই ঐক্য করিয়া বুঝিতে কেবল তত্ত্ব-জ্ঞানী যোগিগণই সমর্থ হইয়াছেন। এই বিরাট পুরুষই বেদে ঈশ্বর নামে অভিহিত। জগতের মঙ্গল উদ্দেশে ইঁহারই শক্তি সকলকে উত্তেজিত করণের জন্য বেদ, মন্ত্র ও

---

* All we can assert is that Space (and Time) are relative realities; that our consciousness of this unchanging relative realities, implies absolute realities equally unchanging in so far as we are concerned; and that the relative realities may be unhesitatingly accepted in thought as a valid basis for our reasonings. &c. &c. &c.

যন্ত্র রূপে পরিণত হইয়াছে। ইনিই জগতের সুতরাং জীব-গণেরও পিতা, মাতা, ধাতা, ভর্ত্তা, গতি এবং বীজ *।

বিরাটের প্রকৃতি সম্যক্‌রূপে পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, জন্য জনকের মধ্যে কোন একটি বিশেষ গ্রন্থি-সূত্র আছে যদ্দ্বারা উভয়ে উভয়েতে সম্বন্ধ। জন্য-যন্ত্র হইতে আকাঙ্ক্ষা বা অভাবের ভাব জনক-যন্ত্রে পরিচালিত হয়, জনক-যন্ত্র তদ্দ্বারা বিচলিত হইলে, সেই অভাব মোচনার্থে যাহা প্রয়োজন, তাহা সেই জনক-যন্ত্র হইতে জন্য-যন্ত্রে পরিচালিত হয়। জীব-যন্ত্র ও বিরাট-যন্ত্র এবং তাহাদিগের অধিষ্ঠাতা জীব-চেতন ও ঈশ্বর-চেতনও পরস্পর সেই সূত্রে গ্রথিত। যে সূত্রে মানব-যন্ত্রে যন্ত্রিত চেতন ঈশ্বর-চেতনে গ্রথিত, তাহাকে ভক্তি বলে, যে সূত্রে বিরাট-যন্ত্রে যন্ত্রিত ঈশ্বর-চেতন জীবে সম্বদ্ধ, তাহাকে অনুগ্রহ বা স্নেহ বলে। ভক্তি, মানব-যন্ত্রে যন্ত্রিত জ্ঞানের বা চেতনের একটি ভাব, বৃত্তি বা গতি বিশেষ। গতির বেগ প্রতিহত না হইলে অনন্ত অবকাশ মধ্যে প্রসারিত হইতে থাকে। ভক্তির বেগও সেইরূপ প্রতিহত না হইলে বিরাটের প্রকৃতি-যন্ত্র ভেদ করিয়া যন্ত্রের অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর-চেতনকে বিচলিত করে। জনক-যন্ত্ররূপী ঈশ্বর-চেতন বিচলিত হইলে, তাঁহার প্রকৃতি-যন্ত্রের দ্বারা, জন্য মানব-যন্ত্রে কল্যাণ বা অনুগ্রহ প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু ঈশ্বর-চেতন্যকে বিচলিত করিতে হইলে, ভক্তির বেগ সেইরূপ প্রবল হওয়া

---

* পিতামহস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্র মোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেবচ॥ গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ। প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানঃ বীজ মব্যযং। ইতি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ৯ অঃ।

প্রয়োজন, যেন প্রকৃতি-যন্ত্র-সম্ভূত অন্যান্য বেগের দ্বারা ইহা প্রতিহত না হয়। লোভ, মোহ, কাম, ক্রোধ, স্নেহ, মমতা প্রভৃতি যে কিছু বেগ অন্তঃকরণে সমুদ্ভূত হয়, তাহা সমস্তই অবরুদ্ধ হইয়া এক মাত্র ভক্তিবেগ প্রবল হইবে। তবে সেই বেগ সমস্ত প্রকৃতি-যন্ত্র আলোড়িত করিয়া প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা ঈশ্বর-চেতনকে বিচলিত করিতে পারিবে। অন্তরে যত প্রকার শক্তি-বেগ আছে তাহা সমস্তই এই এক মাত্র ভক্তি প্রণালীতে প্রবাহিত হওয়া প্রয়োজন। যাহা কিছু দর্শন করিবে, যাহা কিছু শ্রবণ করিবে, যাহা কিছু মনন করিবে, সমস্তই সেই বিরাটরূপী অনন্তদেবের মহিমা। জগৎ তখন আর এ জগৎ থাকিবে না— কেবল সেই বিরাট দেবের অনন্ত শক্তির মহিমা স্বরূপে প্রতিভাত হইবে। সেই অচিন্ত্য শক্তির অনন্ত মহিমা সন্দর্শনে অন্তর বিস্ময়ে মোহিত ও আনন্দে পুলোকিত হইলে, নাম রূপাত্মক জগৎ বিস্মৃত হয়, আপনাকেও বিস্মৃত হইয়া যায়—বিস্ময় ও আনন্দ বেগে হৃদয় উচ্ছ্বলিত হইয়া নয়ন হইতে দরদরিত ভাবে প্রেমধারা বিগলিত হইতে থাকে। ভক্তি, প্রেম, বিস্ময়, আনন্দ, এই সকলের প্রভাবে হৃদয় বিহ্বল হইলে অনন্ত বাসনার সহিত জগচ্চিন্তা যেন আপনা আপনি হৃদয় হইতে বিগলিত হইয়া পড়ে। অনন্য চিন্তায় সেই মহিমা ধ্যানে চিত্ত একাগ্রীভূত হইলে, অন্তরে গুণশক্তির প্রভাব নিবৃত্তি পায়, তখন সেই একাগ্রীভূত-চিত্ত-মধ্যে অবস্থিত হইয়া জ্ঞানও যেন অখণ্ড-মণ্ডল-ব্যাপী অনন্তরূপী বিরাট্‌দেবের আকারে আকারিত হইয়া যায়। অর্থাৎ বিরাটরূপী অনন্ত আত্মাতে সমাহিত হয়। এই জন্যই পাতঞ্জল দর্শনে "যোগশ্চিত্ত বৃত্তি নিরোধঃ" এই সূত্র উল্লেখ

করিয়া পরে "ঈশ্বর-প্রণিধানাদ্বা" এই সূত্রে তাহার বিকল্পতা প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্থাৎ চিত্ত-বৃত্তি-নিরোধ রূপ যোগের দ্বারা অন্তরে জ্ঞানময় আত্মাতে চিত্ত সমাহিত হয়, এবং ঈশ্বরে চিত্ত প্রণিহিত হইলে, বিরাটের জ্ঞানময় আত্মাতে চিত্ত সমাহিত হয়। তবে একটির কার্য্য অন্তরে হইয়া পরে বাহ্য ও অন্তরে জ্ঞানের সাম্যভাব হয়। অপরটির কার্য্য বাহিরে আরব্ধ হইয়া ক্রমশঃ বা জন্মান্তরে অন্তরে ও বাহ্যে জ্ঞান সাম্যভাব প্রাপ্ত হয়। জ্ঞানের সাম্যভাবই জ্ঞানের যন্ত্রিত অবস্থার মোচন। জ্ঞানের যন্ত্রিত অবস্থাই জ্ঞানরূপী জীবের সংসার বন্ধন। এই বন্ধন-মোচনই মুক্তি। অকপট ভক্তির চরম ফল তত্ত্ব-জ্ঞান। অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানই মোক্ষ।

কর্ম্মযোগ—বিরাট পুরুষ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে এইরূপ ভক্তি-যোগ, তত্ত্ব-জ্ঞানী-মহা-যোগীশ্বর-ঈশ্বরাভিধেয় শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা নামক উপনিষৎ শাস্ত্রের নবম, দশম, একাদশ, দ্বাদশ অধ্যায়ে বিশেষ রূপে বর্ণন করিয়াছেন। যাহারা এই বিরাটরূপী নারায়ণকে বুদ্ধির দ্বারা ধারণা করিতে অসমর্থ, তাহাদিগের প্রকৃতি ও প্রবৃত্তি ভেদে বিবিধ প্রকার ভক্তি ও উপাসনা প্রণালী বেদ ও তন্ত্র-শাস্ত্রে নিরূপিত হইয়াছে। তত্ত্ব-জ্ঞানী যোগিগণ মানব-যন্ত্র ও বিরাট যন্ত্রের প্রকৃতি, বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে পর্য্যালোচনা করিয়া সেই সকল প্রণালী অবধারণ করিয়াছেন বলিয়াই তাঁহাদিগের মত বিজ্ঞান সঙ্গত সুতরাং অভ্রান্ত বলা যায়। এবং তাঁহাদিগের নির্ণীত আচার ব্যবহার প্রভৃতি সমাজ প্রণালীও সেই বৈজ্ঞানিক ধর্ম্মের অনুকূল।

ঈশ্বরে ভক্তি ও বিশ্বাসই কর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কোন কর্ম্ম

পুনঃ পুনঃ করিলে অভ্যাস হইয়া যায়। অভ্যাসের দ্বারা অন্তরে সংস্কার জন্মে। সেই সংস্কারের প্রভাবে স্বভাব পরিবর্ত্তিত হয়। স্বভাবের পরিবর্ত্তন হইলে, অন্তরে স্বভাবের প্রবর্ত্তক প্রকৃতি-যন্ত্রেরও অবস্থা পরিবর্ত্তন হওয়া স্বীকার করিতে হইবে। একটি কর্ম্ম পুনঃ পুনঃ করিলে যদি প্রকৃতি-যন্ত্র পরিবর্ত্তিত হয়, তবে, প্রত্যেক বারেই কিছু কিছু ভাবান্তর হইতেছে স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং আমাদিগের প্রত্যেক কর্ম্মের দ্বারাই যে প্রকৃতি-যন্ত্র কোনরূপে না কোনরূপে অভিহত হয়, তাহা অবশ্যই স্বীকার্য্য। অতএব আমাদিগের সদসৎ কর্ম্মের ফল আভ্যন্তরিক প্রকৃতি-যন্ত্রে নিত্যই সঞ্চিত হইতেছে। সেই বাহ্য ও আভ্যন্তরিক প্রকৃতি-যন্ত্র বিচার করিয়া, জ্ঞান-নেত্রদর্শী সেই আর্য্য-মহর্ষিগণ মানব-সমাজের প্রবৃত্তি ভেদে আচার ব্যবহার প্রভৃতি যে সকল বিবিধ প্রকার কর্ম্মযোগ অবধারণ করিয়া গিয়াছেন, সেই সকল উপদেশ বাক্যই শাস্ত্র বলিয়া সাদরে প্রতিপালন পূর্ব্বক আর্য্য সমাজ আবহমান কাল চলিতেছে। অতএব আর্য্য ধর্ম্মের সকল শাখাই বিজ্ঞান-সঙ্গত।

আধুনিক পাশ্চাত্য তত্ত্ব-বিশারদ পণ্ডিতগণের মত আর্য্যমতের সহিত কতদূর ঐক্য-হয় ,তাহা পর্য্যালোচনা করা যাইতেছে। H.-Spencer মহাশয় বলেন যে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সামঞ্জস্যভাবে থাকা উচিত। বিজ্ঞান অতিক্রম করিয়া ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। তদ্বিষয়ে তাঁহার মত এইরূপ;—

"Thus the consciousness of an inscrutable power manifested to us through all phenomena, has been

growing ever clearer; and must eventually be freed from its imperfections. The certainty that on the one hand such a power exists, while on the other hand its nature transcends intuition and is beyond imagination, is the certainty towards which intelligence has from the first been progressing. At this conclusion science inevitably arrives as it reaches its confines; while to this conclusion Religion is irresistably driven by criticism." এই উক্তির দ্বারা এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে জগৎ প্রকাশক অচিন্ত্য-শক্তি দুর্জ্ঞেয়, ইহাকে দুর্জ্ঞেয় বলিয়া সিদ্ধান্ত করা, ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞান উভয়েরই কর্ত্তব্য। পরে অন্যত্র বলিয়াছেন, "Is it not just possible that there is a mode of being transcending intelligence and will, as these transcend mechanical motion? It is true that we are totally unable to conceive any such higher mode of being, but this is not a reason for questioning its existence, it is rather the reverse. Have we not seen how utterly incompetent our minds are to form even an approach to a conception of that which underlies all phenomena? Is it not proved that this incompetency is the incompetency of the conditioned to grasp the unconditioned?" এস্থলে এই অভিপ্রায় প্রকাশ পাইতেছে যে, যে বুদ্ধির অতীত বস্তু নামরূপ-বিশিষ্ট জগৎ পদার্থের উপা-

দর্শি হইয়াছেন তিনি সর্ব্বাবস্থার অতীত বলিয়া আমাদিগের (যন্ত্রিত) অবস্থাপন্ন জ্ঞানশক্তি তাঁহাকে ধারণা করিতে পারে না।

সর্ব্বাবস্থার অতীত, জগতের উপাদান স্বরূপ সেই নিত্য বস্তুর, স্বরূপ নির্ণয় সম্বন্ধে Mr. Mansel এইরূপ বলিয়াছেন—"The absolute and infinite are thus like the inconceivable and imperceptible, names indicating, not an object of thought or consciousness at all, but mere absence of the conditions under which consciousness is possible".

ইহাতে এইরূপ অভিপ্রায় প্রকাশ করিতেছেন যে, স্বয়ং পূর্ণ অনন্ত, এই নামই জ্ঞান বা চিন্তার অতীত। কেবল যেরূপ অবস্থাপন্ন বা ভাবাপন্ন হইলে জ্ঞান-শক্তির ক্রিয়া হয়, সেই অবস্থার বা ভাবের অভাব মাত্র।

Mr. Spencer বলেন "our consciousness, of the unconditioned, being literally the unconditioned consciousness, or raw material of thought, to which in thinking we give definite forms, it follows that an ever present sense of real existence is the very basis of our intelligence."

অভিপ্রায় এই যে, জ্ঞান সকল ভাব বর্জ্জিত হইলে যে অবস্থাপন্ন হয় তাহাই ভাবাতীত বস্তুর জ্ঞান বলা যায়। এ স্থলে দ্বিতীয় consciousness শব্দের এইরূপ অর্থ করা হইয়াছে যথা—স্বয়ং-জ্ঞান, চিন্তার উপাদান, অর্থাৎ চিন্তা করিবার কালে আমরা যাহাকে বিশেষ বিশেষ আকারে পরিণত

করি। ইহাতে সিদ্ধান্ত হইতেছে যে আমাদিগের জ্ঞান-শক্তির অভ্যন্তরে প্রকৃত সত্তার অনুভূতি নিত্য বর্ত্তমান রহিয়াছে।

ইতিপূর্ব্বে প্রদর্শন করা হইয়াছে যে Spencer মহাশয় বলেন যে "to which in thinking we give definite forms" অর্থাৎ চিন্তাকালে আমরা যাহাকে (জ্ঞানকে) বিশেষ আকার প্রদান করি। "আমরা" শব্দটি অহং ভাবের জ্ঞাপক। পূর্ব্বোক্ত উক্তি স্বীকার করিলে অহংভাব জ্ঞানের পরিচালক, সুতরাং জ্ঞান অপেক্ষা ভিন্নসত্তা-বিশিষ্ট কিছু বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু Mr. Spencer ও Mr. Mansel প্রভৃতি অনেকেই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন যে অহংভাব জ্ঞানেতে প্রকাশ পায়, সুতরাং জ্ঞানের অবস্থা বা ভাব বিশেষ। অতএব পূর্ব্বের উক্তিটি অসংলগ্ন হইতেছে। এরূপ উক্তির কারণ কেবল অনুভূতির স্থিরতার অভাব।

Sir W. M. Hamilton বলেন "The absolute is conceived by a negation of conceivability" অর্থাৎ সকল অনুভবনীয় বস্তুর অভাব দ্বারাই নিত্য স্বয়ং পূর্ণ বস্তু অনুভূত হয়।

আভ্যন্তরিক প্রকৃত ভাব চিন্তা করিতে প্রবৃত্ত হইয়া আধুনিক পাশ্চাত্য আত্মতত্ত্বানুসন্ধায়ী পণ্ডিতগণ কিছুই স্পষ্টরূপে অনুভব করিতে পারেন নাই। এই জন্যই Mr. Spencer, Mr. Mansel মহাশয়ের মত সমর্থন করিয়া এইরূপ বলিয়াছেন—"clearly a true cognition of self implies a state in which the knowing and known are one, in which subject

and object are identified; and this Mr. Mansel rightly holds to be the annihilation of both.

So that the personality of which each is conscious, and of which the existence is to each a fact beyond all others the most certain, is yet a thing which cannot truly be known at all; knowledge of it is forbidden by the very nature of thought."

তাঁহারা যাহা বলিলেন তাহা প্রকৃত বটে, কিন্তু অনুভূতির দোষে চরম সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে পারিলেন না। পূর্ব্বোক্ত বাক্যের অভিপ্রায় এই যে প্রকৃত আত্মজ্ঞান বলিতে জ্ঞানের সেই অবস্থাকেই বুঝায় যাহাতে জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় ভাব একীভূত হয়, যাহাতে প্রমাতা এবং প্রমেয় একই পদার্থ রূপে প্রকাশ পায়। Mr. Mansel এই অবস্থাকে উভয় ভাবের ধ্বংসাবস্থা বলিয়া প্রকৃতই বিবেচনা করিয়াছেন। এস্থলে Mr. Spencer ও Mr. Mansel উভয়েই আর্য্য-তত্ত্বজ্ঞান-সম্মত প্রকৃত কথাই বলিলেন, যে আত্মাকে জানিতে গেলে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়, প্রমাতা ও প্রমেয়, এই উভয় ভাবই ধ্বংস হয়। কিন্তু উভয় ভাব ধ্বংস হইয়া অবশিষ্ট কিছু থাকে কি না, সে সম্বন্ধে Mr. Mansel কিছুই বলিলেন না। এবং Mr. Spencer পরে সিদ্ধান্ত করিলেন যে আত্মার প্রকৃত জ্ঞান লাভ করা যায় না; চিন্তা-বৃত্তির যেরূপ প্রকৃতি তাহাতে এই জ্ঞান লাভ সম্ভবে না।

পূর্ব্বোক্ত সকল মত পর্য্যালোচনা করিয়া জানা যাইতেছে যে স্পষ্টতই হউক বা বাক্-ভঙ্গির দ্বারাই হউক, চিন্তাবৃত্তি

রহিত হইলে, জ্ঞানে যে কোন প্রকার অচিন্ত্য ভাব অবশিষ্ট থাকে তাহা সকলেই স্বীকার করিতেছেন। এবং সেই অচিন্ত্য ভাবই যে স্বয়ং-পূর্ণ নিত্য-সত্তা-বিশিষ্ট প্রকৃত বস্তুর জ্ঞান, তাহাও কেহ কেহ কোন কোন স্থলে স্বীকার করিয়াছেন। কিন্তু স্পষ্টরূপে ধারণা করিতে সমর্থ না হওয়াতে, তাঁহাদিগের মত কেবল সংশয়ে ও তর্কে পর্য্যবসিত হইয়াছে।

জ্ঞান যে দ্রব্য-বিশেষ, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের অনেকেই সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। এবং ইতিপূর্ব্বে তত্ত্ব-জ্ঞান পরিচ্ছেদের অহং-ভাব বিচারের স্থলেও প্রদর্শিত হইয়াছে যে জ্ঞান, দ্রব্য বিশেষ, প্রকৃতি-গত শক্তির দ্বারা যন্ত্রিত। শক্তির দ্বারা পরিচালিত হইয়াই প্রমাতা প্রমেয় প্রমাণ, জ্ঞাতা জ্ঞেয় জ্ঞান, বা কর্ত্তা কর্ম্ম ও ক্রিয়া, জ্ঞান এই তিন ভাবে প্রকাশ পায়। যদ্দ্বারা প্রমাতা প্রমেয়-সম্বন্ধে প্রমাতা-স্বরূপে প্রকাশ পায়, এবং যদ্দ্বারা প্রমেয় প্রমাতা-সম্বন্ধে প্রমেয়-স্বরূপে প্রকাশ পায়, তাহাকে প্রমাণ বলা যায়। অর্থাৎ জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় এই দুইটী মাত্র ভাবই যে জ্ঞানে প্রকাশ পায় এমত নহে। জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় যে সম্বন্ধ-সূত্রে পরস্পর গ্রথিত, সেই ক্রিয়ারূপ সম্বন্ধ-সূত্রও জ্ঞানে প্রকাশ পায় অর্থাৎ জ্ঞেয় বস্তু যদি দর্শনের বিষয় হয়, তাহা হইলে জ্ঞান দর্শন-ক্রিয়ার ভাব ধারণ করিয়া জ্ঞেয় বস্তুকে জ্ঞাতার সম্বন্ধে প্রকাশ করে। যদি শ্রবণের বিষয় হয়, তবে জ্ঞান শ্রবণ-ক্রিয়ার ভাব ধারণ করিয়া জ্ঞেয় বস্তুকে প্রকাশ করে। পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে জ্ঞানের শক্তি, প্রকাশ করা এবং প্রকাশ হওয়া। যদি জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় ভাব অর্থাৎ কর্ত্তৃভাব

ও কর্ম্মভাব তিরোহিত হয়, তবে করা ও হওয়া এই দুই ভাব তিরোহিত হইয়া, নিত্য শক্তির গুণে জ্ঞানের প্রকাশ-ভাব মাত্র অবশিষ্ট থাকিবে। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই ভাব ধারণা করিতে সমর্থ হন নাই। তাঁহারা ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে প্রমাতা ও প্রমেয় ভাবকে সহসা বর্জ্জন পূর্ব্বক অন্তরে অনুভব করিতে প্রবৃত্ত হইলে, প্রমাতা প্রমেয়ের ভাব বর্জ্জিত হইল বটে, কিন্তু যে শক্তি-দ্বারা চালিত হইয়া জ্ঞান এই ভাব ধারণ করে, সেই শক্তির বেগ এক কালে নিবৃত্ত হইল না। এই শক্তিকে Mr. Spencer মহাশয় আভ্যন্তরিক "persistence of force" বলিয়া অনেক স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। এক দিকে সেই শক্তির বেগে জ্ঞান অন্তরে আপনা আপনি চঞ্চল হইতে লাগিল, অথচ ইচ্ছা-শক্তির প্রভাবে কোন আকার ধারণ করিতে পারিল না। অপর দিকে, শক্তি-বেগ এক কালে নিবৃত্ত হইলে, জ্ঞান যে গুণ-শক্তির অতীত বস্তুর আকার ধারণে সমর্থ হইত, সেই শক্তি-বিলোড়িত-জ্ঞান সে আকার ধারণে সমর্থ হইল না। সেই অবস্থায় 'অনুভব করিব' এইরূপ কোন প্রকার ইচ্ছা বা সংকল্প উদয় হইলে জ্ঞান আরও চঞ্চল হইয়া উঠিল। সেই চঞ্চলীভূত জ্ঞান আপনার অভ্যন্তরে কোন প্রকার স্থির নিশ্চল ভাব অনুভব করিতে পারে না। সুতরাং সেই অবস্থাব অনুভূতি কেবল অস্থির সংশয়াত্মক হইয়া পড়ে। এই ভাবটি অন্তরে অনুভব করিয়া না দেখিলে প্রকৃত রূপে ধারণা হইবে না। জ্ঞানের যন্ত্রিত অবস্থাই জীবের বন্ধন। শক্তির বেগ এক কালে নিবৃত্ত করিয়া জ্ঞানকে যন্ত্রিত অবস্থা হইতে মোচন করিতে

পারিলে, তবে সেই জ্ঞানে নির্ম্মল নিশ্চল নিত্য ভাবের উদয় হয়*। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ যে "negation of thought" অর্থাৎ চিন্তা বৃত্তির অভাবই তাহার উপায় বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, আর্য্য-তত্ত্বজ্ঞানীগণও সেই অভিপ্রায়ে চিত্তবৃত্তি নিরোধের উপদেশ দিয়াছেন। কিন্তু তাহা সহসা হইতে পারে না—অভ্যাস ও কৌশল প্রয়োজন। সেই কৌশল—যোগ। তাহা কেবল আর্য্য-তত্ত্ব জ্ঞানিরাই জানেন।

জয় জয় দেব জয় বিশ্বেশ্বর।
জয় বিশ্বময় জয় বিশ্ব-ধর॥
জয় বিশ্বকারী জয় বিশ্ব-হারী।
তুমি হে অনন্ত বিশ্বরূপ ধারী॥
কি অদ্ভুত দেব মহিমা তোমার।
বিশ্বকর্ম্মা নিজে বিশ্ব অবতার!
অনন্ত মহিমা নাহিক উপমা।
যে দিকে নিরখি নাহি দেখি সীমা॥
অনন্ত আকাশ কেবলি চেতন।
ব্যোমরূপী দেব ব্রহ্ম সনাতন॥
নাহি শশি নাহি রবির কিরণ।
নাহি ক্ষিতি জল নাহিক পবন॥
নাহি দেশ কাল নাহিক আলোক।
নাহি অন্ধকার নাহি লোকালোক॥
নাহি দরশন নাহি পরশন।
নাহি ঘ্রাণ রস নাহিক শ্রবণ॥

---

* Mr. Spencer এই অভিপ্রায়ে প্রকৃত কথাই বলিয়াছেন,—"Comprehension must be something other than comprehension before the ultimate fact can be comprehended"

অনন্ত গগণ শুধুই চেতন ।
অনন্ত চেতন চেতনে মগন ॥
সকলি চেতন ব্রহ্ম নিরঞ্জন ।
আপনার ধ্যানে আপনি মগন ॥
চেতনা আকাশে নাদ পরকাশে ।
মহানাদ রবে বিজ্ঞান বিকাশে ॥
সে ধ্যান ভাঙ্গিল আপনা স্মরিল ।
শাক্তিরূপা দেবি উল্লাসে ভাসিল ॥
শিহরিল দেব দেবির পরশে ।
তেজো রাশিময় গগণে বিকাশে ॥
শক্তিময় দেহ পূর্ণ সচেতন ।
তিনি সে পুরাণে ব্রহ্ম নারায়ণ ॥
বেদের ঈশ্বর সাংখ্যের প্রকৃতি ।
তন্ত্রে আদ্যাশক্তি সংসার প্রসূতি ॥
স্মৃতি রূপে দেবী কাল প্রসবিল ।
গগণ উজলি আলোক ছুটিল ॥
ব্যাপিল আলোক হয়ে অণ্ডাকার ।
শ্রীচৈতন্য লীলা করিল প্রচার ॥
গাইল সে লীলা কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন ।
যার গুণ-যশে ভরেছে ভুবন ॥
এই বিশ্ব-যন্ত্র অনন্ত মাঝারে ।
বাঁধা শক্তিরূপ কোটি কোটি তারে ॥
রবির অন্তরে ভূতল-গহ্বরে ।
সাগর-গভীরে অচল-শিখরে ॥
অনন্ত গগণে যে যথা রয়েছে ।
এক সুরে মিলি সকলে বাজিছে ॥
ছার সে বিজ্ঞান পাগলের প্রায় ।
তাই শক্তি তত্ব বুঝিবারে চায় ॥

জেনেছে বশিষ্ঠ * জেনেছে মার্কণ্ড † ।
তন্ন তন্ন যারা করেছে ব্রহ্মাণ্ড ॥
যে জন জেনেছে সে জন মজেছে।
অসার বাসনা সকলি ছেড়েছে ॥
সেই প্রেমে যার অন্তর গলেছে।
প্রেমানন্দ-বারি নয়নে ঝরেছে ॥
এ সংসার সুখ সকলি ভুলেছে।
ধন্য সেই ভবে জনম লয়েছে ॥

জেনেছিল শুক জেনেছে কপিল।
যার যশোরাশি ত্রিলোক ব্যাপিল ॥
জেনেছে নারদ. সেই তপোধন।
তাই বীণা লয়ে ভ্রমিত ভুবন ॥
গাইত সে গুণ মজাইয়ে চিত।
গুণ গান তাঁর জীবনেব ব্রত ॥
গলিত হৃদয় সেই প্রেম-নিরে।
প্রেমানন্দ-বারি দুই চক্ষে ঝরে ॥
উঠিত তখন বীণার ঝঙ্কার !

---

* অবিদ্যা সরিতঃ পারমাত্মলাভাদৃতে কিল।
রাম নাসাদ্যতে তদ্ধি পদমক্ষয় মুচ্যতে ॥
কুতো জাতেয় মিতিতে রামমাস্ত বিচারণা।
ইমাং কথমহং হন্মীত্যেষা তেঽস্ত বিচারণা ॥
অস্তং গতায়াং ক্ষীণায়ামস্যাং জ্ঞাস্যসি রাঘব।
যত এষা যথা চৈষা যথা নষ্টেত্য খণ্ডিতং ॥
ইতি যোগবাশিষ্ঠঃ।

† যচ্চ কিঞ্চিৎ ক্বচিদ্বস্তু সদসদ্বাখিলাত্মিকে।
তস্য সর্ব্বস্য যা শক্তিঃ সাত্বং কিং স্তুয়তে ময়া।
ইতি মার্কণ্ডেয় চণ্ডী।

জয় শ্রীচৈতন্য বিশ্ব-অবতার ॥
জয় জয় দেব জয় বিশ্বেশ্বর।
জয় বিশ্বময় জয় বিশ্বধর ॥
জয় বিশ্বকারি জয় বিশ্ব-হারি।
তুমি হে অনন্ত বিশ্বরূপ ধারী ॥
কি অদ্ভুত দেব মহিমা তোমার।
বিশ্বকর্ম্মা নিজে বিশ্ব-অবতার ॥

বলিহারি কারিকুরি চাতুরির মেলা।
যে দিকে নিরখি হেরি ভাংগড়ের খেলা ॥
দেবাসুর নর আদি যত যন্ত্র গড়েছ।
আহা মরি যন্ত্রি-দেব! কিবা সুর বেঁধেছ ॥
অগণন জীব যন্ত্র যে যেখানে রয়েছে।
"আমি" বলে এক সুরে সকলেতে বাজিছে ॥
এই নর-যন্ত্র দেব! কত সাজে সাজিছে।
যে দিকে বাজাও তুমি সেই দিকে বাজিছে ॥
"আমি আমি" বলে ভবে সকলেতে নাচিছে।
আমি কারে বলে কিন্তু কেহ নাহি ভাবিছে ॥
মৎস্য কুর্ম্ম বরাহাদি সকলের সার।
হয়েছ ভবের মাঝে "আমি" অবতার ॥
সাবাশ চাতুরি তব, দেব শ্রীচেতন।
সকলেতে আছ কিন্তু না হেরে নয়ন ॥
বলিহারি কি চাতুরি চতুরের চূড়া।
হেন জন নাহি তার বুঝে এক গুঁড়া ॥
যদি ঐ পদে মতি রাখ দয়াময়।
কেমন চতুর তুমি বুঝিব তোমায় ॥

শ্রীঅম্বিকাচরণ শর্ম্মা।

বেদান্ত দর্শন ও রাজযোগ।

গ্রন্থকারের জীবন বৃত্তান্ত।

সভাপতি স্বামি মান্দ্রাজ নগরে ইংরাজী ১৮৪০ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের এক জন ধনী এবং মহৎ ব্রাহ্মণ-কুল সম্ভূত। দয়া এবং মহতী দানশীলতার জন্য তাঁহার পিতা তথায় বিলক্ষণ খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। প্রকৃতি দেবীর অনুগ্রহে অতি অল্প বয়সেই তাঁহার বুদ্ধিবৃত্তি প্রস্ফুটিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ বর্ষ বয়সে তিনি ইংরাজী ভাষায় বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, এবং অন্যান্য বিষয়েও শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি তত্রত্য ক্রিশ্চিয়ন চর্চ্চ কলেজ নামক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। তাঁহার কবিতাশক্তি ও কল্পনা শক্তি অতি সুন্দর ছিল। তিনি পঠদ্দশায় তামিল ভাষায় কবিতা রচনা করিয়া বন্ধুবর্গ ও গুরুজনের প্রশংসা-ভাজন হইয়াছিলেন, তাঁহার কোন কোন গ্রন্থ ভাষা-শিক্ষার উপযোগী বলিয়া পরিগৃহীত হইয়াছে।

বাল্যাবস্থা হইতেই ধর্ম্ম বিষয়ে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল। দেবাধিদেব মহাদেবের স্তুতি-সঙ্গীত রচনা করিয়া তিনি সর্ব্বদাই তাঁহার কবিত্বের পরিচয় প্রদান করিতেন। স্বদেশ-বাসীগণ

তাঁহার কবিতা সকল সাদরে গ্রহণ করিয়া গৌরবার্থ অরুৎপ মূর্ত্তি বলিয়া তাঁহার সম্ভাষণ করেন। সঙ্গীত বিদ্যাতেও তিনি বিলক্ষণ পারদর্শী।

অন্যান্য ধর্ম্মের তত্ত্ব জানিবার অভিলাষে তিনি ব্রহ্মদেশ পর্য্যন্ত পর্য্যটন করেন। তাঁহার শ্বশুর তথায় বাণিজ্য করিতেন, তিনি তাঁহারই নিকট থাকিতেন। তথায় থাকিয়া বৌদ্ধ পুরোহিত পুঙ্গিদিগের নিকট বৌদ্ধ ধর্ম্মের সকল তত্ত্ব শিক্ষা করেন। এই স্থানে তিনি এক বৎসর বাস করেন।

ব্রহ্মদেশ হইতে প্রত্যাগত হইয়া তিনি নাগপাটামে নাগূরম-স্থান নামক মন্দিরে গমন পূর্ব্বক তত্রত্য লব্ধপ্রতিষ্ঠ ফকিরদিগের নিকট মসলেম ধর্ম্মের সার-তত্ত্ব সকল অবগত হইলেন।

এই প্রকার পর্য্যটনে তাঁহার তিন বৎসর অতীত হইল। ফল এই হইল যে বৌদ্ধ, খ্রীষ্টীয় বা মহম্মদ ধর্ম্মের মধ্যে কোন ধর্ম্মেই তাঁহার মনের অভিলাষ পরিতৃপ্ত হইল না। প্রকৃত জ্ঞান লাভ বা পরমাত্মার সহিত ঐকতান সংস্থাপনার্থ কোন ধর্ম্মকেই উপযোগী বলিয়া তাঁহার বোধ হইল না। তথা হইতে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক একটি রাজ কার্য্যে নিয়োজিত হইয়া, শারীরিক ও মানসিক শ্রম সহকারে হিন্দু-শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার শ্রম বিফল হয় নাই, তিনি বেদ এবং দর্শন শাস্ত্রে পারদর্শী হইলেন। এই অধ্যয়নে তাঁহার সাত বৎসর কাল অতিবাহিত হইল, এবং তাঁহার জীবনেরও এক্ষণে ঊনত্রিংশ বৎসর সম্পূর্ণ হইল।

যদিও তিনি আর্য্যদিগের জ্ঞান-গর্ভ-গ্রন্থ সকল অধ্যয়ন করিয়াছিলেন, তথাপি প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হন

নাই। তিনি ধার্ম্মিক ও ঈশ্বর পরায়ণ হইলেন এবং দয়া ও দানশীলতা শিক্ষা করিলেন। কিন্তু এই সকল গুণ সত্ত্বেও তিনি মনের শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই। ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ করিবার লালসা তাঁহার অত্যন্ত বলবতী, তাহা এখনও চরিতার্থ হয় নাই। তিনি বুঝিলেন যে সেই জ্ঞান, গ্রন্থ অধ্যয়নে লাভ করা যায় না, ঐশিতত্ত্বের নিগূঢ় মর্ম্ম কেবল ঈশ্বরের অনুগ্রহের দ্বারাই লাভ হইয়া থাকে।

উনত্রিংশ বৎসর বয়সে তাহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভের আকাঙ্ক্ষায় চিত্ত এরূপ উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিল যে তিনি পরমাত্মা সম্বন্ধে স্বপ্ন দর্শন করিলেন। তিনি তাঁহাকে কহিলেন, "সভাপতি আমাকে পরমাত্মা বলিয়া জান, আমি সকল সৃষ্ট বস্তুতে আছি এবং আমাতে সকল সৃষ্ট বস্তু আছে। তুমি আমা হইতে ভিন্ন নহ, এবং কোন জীবই আমা হইতে ভিন্ন নহে, তোমাকে পবিত্র এবং সরল স্বভাব দেখিয়া তোমার নিকট এই রহস্য প্রকাশ করিলাম। আমি তোমাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিলাম, শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিয়া অগস্ত্যাশ্রমে গমন কর, তথায় যোগী ও ঋষির আকারে আমার দর্শন পাইবে।" বাক্য নিবৃত্তি হইবামাত্র তিনি শয্যা হইতে শীঘ্র গাত্রোত্থান করিলেন, অন্তর বিশুদ্ধ-আনন্দ-পূর্ণ ভাবে ভাবিত হইল, তাহাতেই তিনি সমস্তই বিস্মৃত হইলেন, এই সংসার যেন আপনা হইতেই তাঁহার চিত্ত হইতে বিগলিত হইয়া পড়িল, এমন কি তিনি আপনাকেই বিস্মৃত হইয়া গেলেন। রাত্রি একটার সময় এই স্বপ্ন দর্শন করিয়া সেই নিঃশব্দ নিশীথ সময়ে তাঁহার ভার্য্যা ও দুই পুত্র পরিত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র উত্তরীয় বস্ত্রে আবৃত হইয়া, গৃহ

হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক সমস্ত রাত্রি ভ্রমণ করিয়া বেদশ্রেণী স্বয়ম্ভু স্থল নামক মহাদেবের মন্দিরে উপনীত হইলেন। এই মন্দির মান্দ্রাজ হইতে সার্দ্ধ তিন ক্রোশ অন্তরে অবস্থিত। তিনি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া তিন দিন তিন রাত্রি কাল মহাদেবের অগ্রে উপবিষ্ট রহিলেন। তৃতীয় দিবসে স্বপ্নে দর্শন করিলেন, মহাদেব তাঁহাকে কহিতেছেন, "এই লিঙ্গকে অনন্ত বিশ্বাত্মার বৃন্ত বা ব্রহ্ম স্বরূপ বলিয়া জানিবে। যিনি এইরূপ চিন্তা করেন তিনি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করেন। হে বৎস! আমি আশীর্ব্বাদ করি অগস্ত্য আশ্রমে গমন কর।"

অগস্ত্য-আশ্রম যথায় অবস্থিত সেই নীলগিরি অভিমুখে যাত্রা করণার্থ তাঁহার যে মন্তব্য ছিল তাহা এই স্বপ্নের দ্বারা আরও দৃঢ়ীভূত হইল। অনন্তর তিনি নিবীড় অরণ্য-মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উত্তীর্ণ হইয়া ক্রমে ক্রমে সুরুলী, আলাগড়, সাতারা-গিরি পর্ব্বতশ্রেণী, কুটালা, এবং পাপনাশন প্রভৃতি স্থান অতিক্রম করিয়া অগস্ত্য-আশ্রমে উপনীত হইলেন। এই আশ্রমের চারি দিকে বন, সেই ভয়ঙ্কর পথহীন অরণ্য উত্তীর্ণ হইতে তাঁহাকে বিলক্ষণ কষ্ট সহ্য করিতে হইল। তিনি অনেকবার ভয়ঙ্কর বন্য পশু সমূহের সমক্ষে পড়িয়াছিলেন। পরমেশ্বরের অনুগ্রহ ও আশ্রয়ে না থাকিলে তাঁহাকে অবশ্যই সেই সকল দুর্দ্দান্ত পশুর দ্বারা বিনষ্ট হইতে হইত। উপযুক্ত আহারাভাবে তাঁহার কষ্ট আরও বৃদ্ধি হইল। কিছুকাল কেবল ফল মূল আহার করিয়াই তাঁহাকে জীবন ধারণ করিতে হইয়াছিল, তৎকালে কোন প্রকার বিষাক্ত মূল খাইবারও বিলক্ষণ সম্ভাবনা ছিল।

তিনি এই ঘোর অরণ্য মধ্যে ঋষিগণের অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। অনেক দিন পর্য্যন্ত বৃথা অনুসন্ধানে ক্লান্ত ও নিরাশ হইয়া এক দিবস একটি বৃক্ষমূলে বসিয়া আছেন, এমত কালে স্বপ্ন দর্শন করিলেন—তাঁহাকে কহিতেছে যে তিনি যে স্থানে বসিয়া আছেন, সেই স্থান হইতে তিন মাইল অন্তরে এক যোগীরাজ আছেন, তিনি তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার শিষ্যত্ব স্বীকার করুন্। এই স্বপ্নের দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া তিনি গাত্রোত্থান পূর্ব্বক চলিতে লাগিলেন। উদ্দিষ্ট স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন, দৃঢ় পর্ব্বত মধ্যে অর্দ্ধ মাইল দীর্ঘ একটি নির্ম্মিত গহ্বর, সেই গহ্বরের দ্বারদেশে একটি লোক দণ্ডায়মান,—পরে জানিলেন যে তিনি যোগীরাজের প্রধান শিষ্য। যোগীরাজের নিকট তাঁহাকে লইয়া যাইতে কহিলে ঐ শিষ্য জিজ্ঞাসা করিলেন আপনি কি বেদশ্রেণীর মন্দিরে মহাদেব কর্ত্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়াছেন? কেন না আমার গুরু ইতিপূর্ব্বে বলিতেছিলেন যে এইরূপ একটি লোক আমাদিগের নিকট আসিতেছেন। তিনি স্বপ্ন বৃত্তান্ত সকল স্বীকার করিলে যোগীবর তাঁহাকে গুরুদেবের নিকট লইয়া গেলেন। ঐ পরম মাননীয় গুরু-যোগীরাজের সমক্ষে আপনাকে উপনীত দেখিয়া তাঁহার অন্তঃকরণ আনন্দে পরিপূর্ণ হইয়া উঠিল। তিনি সাষ্টাঙ্গে প্রণত হইলেন। যোগীরাজ অতি প্রাচীন, মুখমণ্ডল করুণাপূর্ণ এবং ঐশীভাবে উজ্জ্বলীভূত। তিনি আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন "আমি সমাধির দ্বারা জানিয়াছি যে আমার নিকট আসিয়া ব্রহ্মজ্ঞান উপদিষ্ট হইবার কারণ মহাদেব তোমাকে আদেশ করিয়াছেন। আমি তোমাকে শিষ্য বলিয়া গ্রহণ করিলাম এবং অদ্য হইতে

তোমাকে আদৈতৎ-কুণ্ড-মূর্ত্তি অর্থাৎ আহুত বলিয়া সম্বোধন করিব।”

গুরুদেব প্রথমতঃ বন্য জন্তুদিগের নিকট আত্ম পরিত্রাণের জন্য গূঢ়-মন্ত্র উপদেশ দিলেন এবং দ্বিতীয়তঃ যোগাভ্যাসের সৌকার্য্যার্থে দৈবীদৃষ্টি প্রদান করিলেন।

অল্পকালের মধ্যে তিনি ব্রহ্মজ্ঞানী হইলেন, এবং সমাধি অভ্যাস করিতে লাগিলেন। এমন কি অনন্যভাবে চিত্ত সমাহিত করিয়া অনাহারে কিছুকাল বসিয়া থাকিতে পারিতেন। তিনি ফল মূল আহার করিয়া গুরুর সহিত এক গহ্বরে বাস করিতেন।

নয় বৎসর কাল অতীত হইলে ভারতের প্রাচীন ঋষিগণের আশ্রম দর্শনার্থ যাত্রা করিবার মানসে তিনি গুরুর নিকট বিদায় গ্রহণ করিলেন। গুরুদেব তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন “বৎস যাও যে সকল জ্ঞান তুমি উপদেশ পাইয়াছ তাহা প্রচার করিয়া জগতের মঙ্গল সাধনে যত্ন করিও। গৃহস্থদিগের মঙ্গল জন্য অকপটে জ্ঞানোপদেশ দিবে; কিন্তু সাবধান যেন আত্ম-গৌরব-বশে বা লোকের অনুনয়ে, ধর্ম্মদ্রোহীগণের সমক্ষে কোন অদ্ভুত বা অলৌকিক ব্যাপার প্রদর্শন করিও না। তিনি গুরু-দেবের অগ্রে প্রণত হইলেন এবং স্বীকার করিলেন যে মুমুক্ষু ব্যতিরেকে অন্য কাহারও সমক্ষে যোগের উচ্চতম জ্ঞান প্রকাশ করিবেন না। তদনন্তর তথা হইতে প্রস্থান করিয়া লোকালয়ে উপনীত হইলেন।

তিনি আশ্রম দর্শন মাত্রায় প্রবৃত্ত হইয়াই, বেদান্ত-সিদ্ধান্ত-সমরস-ব্রহ্মজ্ঞান-রাজযোগ-কৈবল্যানুভূতি নামক গ্রন্থ তামিল

ভাষায় প্রচার করিলেন। ভারতের অনেক প্রধান প্রধান নগরীতে সাধারণ সমক্ষে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন।

তিনি ভারতের প্রায় সকল পুণ্যতীর্থ এবং আশ্রম দর্শন করিয়াছেন। কোন কোন স্থানে প্রকৃত ঋষি এবং যোগীদিগের সহিত তাঁহার সন্দর্শন হয়। ভারতের প্রাচীন রত্ন-ভাণ্ডারের স্বরূপ এই সাধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া তিনি অনেক অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছেন। তন্মধ্যে একটিকে অতি অপূর্ব্ব বলিয়া ঐস্থানে বর্ণন করিতেছি। হিমালয় অতিক্রম পূর্ব্বক মানস-সরোবরের তীরে উপনীত হইয়া যৎকালে ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন, তিনি অনুভব করিলেন যেন কেহ তাঁহার নিকট আসিতেছেন। নেত্র উন্মীলন করিয়া দেখিলেন, তিনটি ঋষি প্রাচীন আর্য্য-জনোচিত বসনে পরিবৃত হইয়া অগ্রে দণ্ডায়মান। দেখিবা মাত্র ভয় ও বিস্ময়ে উত্তেজিত হইয়া গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহারা উপবিষ্ট হইয়া তাঁহাকেও তদনুরূপ উপবিষ্ট হইতে সঙ্কেত করিলেন, কিন্তু তাঁহাদিগের সমক্ষে উপবিষ্ট হইতে তিনি অতি সম্মানের সহিত অস্বীকার করিলেন, এবং যাবৎ তাঁহাদিগের সহিত কথোপকথন হইতে লাগিল তাবৎ দণ্ডায়মান রহিলেন। তাঁহার গুরু, অগস্ত্য আশ্রম, তাঁহার তীর্থ ভ্রমণ, এবং তদনুরূপ অন্যান্য বিষয়েও তাঁহারা তাঁহাকে প্রশ্ন করিলেন। তিনি তাঁহা-দিগকে যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করিলেন। তাঁহার জ্ঞান ও শিষ্টাচারে তাঁহারা পরিতুষ্ট হইলেন বলিয়া বোধ হইল। তদ-নন্তর তাঁহারা তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে কহিলেন। তাঁহারা এতদুর পর্য্যন্ত বলিলেন যে তাঁহার ইচ্ছা হইলে তাঁহারা তাঁহাকে

অষ্টসিদ্ধি প্রদান করিতে পারেন। অষ্টসিদ্ধি—অষ্টবিধ আত্ম-শক্তি। ইহা প্রাপ্ত হইলে লোকে অদ্ভুত ক্রিয়া সকল সম্পন্ন করিতে পারে। আমাদিগের স্বামী উত্তর করিলেন হে পবিত্র মুনিগণ! আপনাদিগের দর্শনেই আমি যথেষ্ট অনুগৃহীত হইয়াছি, আমার ঐ সকল সিদ্ধিলাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। আমার সকল কামনাই তৃপ্ত হইয়াছে। এক্ষণে এই মাত্র বাসনা যেন নিষ্কাম ব্রহ্ম-জ্ঞান-যোগতপস্যায় এই পৃথিবীতে আমার জীবিত কাল অতিবাহিত হয়। তাঁহারা তাঁহার এই প্রত্যুত্তরে পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ব্রহ্ম-জ্ঞান-গুরু-যোগী উপাধি প্রদান করিলেন, এবং কহিলেন, "হে বৎস! যদি অন্য কোন বিষয়ে আমরা তোমার কোন কার্য্য করিতে পারি তাহা হইলে প্রার্থনা কর।" তাহাতে তিনি সাধারণ জনের দর্শনাতীত দেবগিরি কৈলাশ দেখিতে ইচ্ছা করিলেন। তাঁহারা তাঁহার সেই বাসনা পূর্ণ করিতে স্বীকার করিয়া সকলেই আকাশমার্গে কিছুকাল কৈলাসাভি-মুখে গমন করিলেন। পথিমধ্যে তাঁহারা তাঁহাকে, ঐ পবিত্র দেবগিরির ধবল শৃঙ্গ, নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন। তিনি ভাগ্যবলে তথায় উপনীত হইয়া গুহামধ্যে সমাধিস্থিত মহা-দেবকে দর্শন করিলেন। শিব-সন্দর্শনে তাঁহার অন্তর আনন্দ-বেগে উচ্ছলিত হইয়া উঠিল। সেই বেগ তাঁহার মুখ হইতে শ্লোকের আকারে বহিঃসৃত হইল। সেই ঋষিগণ শিব-বর্ণন স্তুতি-মালা বলিয়া সেই সকল শ্লোকের আখ্যা প্রদান করিলেন॥

কৈলাস হইতে অবরোহণ করিয়া যথায় সকলে পূর্ব্বে উপ-বিষ্ট ছিলেন পুনর্ব্বার তথায় আসিয়া সকলে উপনীত হইলেন,

আমাদিগের স্বামি মহাশয় সেই মহাত্মাগণের নাম জানিবার জন্য প্রার্থিত হইলেন। প্রথম ঋষি আপনাকে শুক বলিয়া এবং দ্বিতীয় আপনাকে ভৃঙ্গী বলিয়া পরিচয় দিলেন। কিন্তু তৃতীয় ঋষি কহিলেন "নাম জানিবার প্রয়োজন কি? তোমাকে নিষ্কামী ব্রহ্মজ্ঞানী দেখিয়া আমরা সকলেই সন্তুষ্ট হইয়াছি।" অনন্তর তাঁহারা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিয়া সেই স্থানেই অন্তর্হিত হইলেন।

অনন্তর তিনি ভারতে প্রত্যাগমন করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। পথিমধ্যে অনেক ক্লেশ উপস্থিত হইয়াছিল কিন্তু তিনি সমস্তই দূরীভূত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একদা তিনি এবং তাঁহার সমভিব্যাহারী অন্যান্য সাধুগণ নেপালের পর্ব্বত-শ্রেণীর মধ্য দিয়া গমন করিতেছিলেন এমত কালে তুষার-রাশি প্রবল ভাবে পতিত হইতে লাগিল ও তজ্জনিত মর্ম্মভেদী শীত উপস্থিত হইল। তাঁহার সঙ্গীগণের মধ্যে অনেকেরই জীবন সংশয়াপন্ন দেখিয়া তিনি স্বীয় দেব-শক্তি প্রভাবে সেই বিপদ হইতে তাহাদিগকে উদ্ধার করিলেন। তুষার-রাশি দুই দিকে পড়িতে লাগিল, মধ্যে পরিষ্কার পথ দিয়া তাঁহারা কিছুমাত্র শীত অনুভব না করিয়া গমন করিতে লাগিলেন।

তিনি নেপাল রাজ্য মধ্যে পশুপত নাথ, পঞ্চ কেদার, পঞ্চভদ্রি দর্শন করিয়া পরিশেষে লাহোরে ছয় মাস কাল অবস্থিতি করেন। এই গ্রন্থ ঐ সকল উপদেশের সার-সংগ্রহ। ইহাতে অনেক বিষয় পরে সংযোজিত হইয়াছে এবং ইহার দ্বিতীয় খণ্ড এককালে নূতন। যদি কেহ এই গ্রন্থ হিন্দী বা বাঙ্গালাতে অনুবাদ পূর্ব্বক গ্রন্থকারের নাম ও চিত্র সংযুক্ত করিয়া প্রচার করিতে ইচ্ছা করেন, তৎসম্বন্ধে আমাদিগের মাননীয় স্বামী মহাশয়ের সম্পূর্ণ অনুমোদন রহিল।

যিনি যৌবনের পরিণতাবস্থাতে পিতৃ-পৈতামহিক আবাস গৃহ, প্রিয়তম পুত্র কলত্র, এবং সংসারের যে কিছু প্রিয়তম ও মনোহর তাহা সমস্তই এক কালে বিসর্জ্জন দিয়াছেন, সেই মহাত্মারই এই সংক্ষিপ্ত ও অসম্পূর্ণ জীবন-চরিত বর্ণিত হইল। ঐতিহাসিক রাজনীতি কুশল এবং বীর পুরুষগণের জীবন অপেক্ষা এ প্রকার মহাত্মার জীবন আমাদিগের অধিকতর প্রশংসা বিস্ময় ও সম্মানের ভাজন। মানব জাতিকে যুদ্ধে পরাভূত করা অপেক্ষা পাশব ইন্দ্রিয় সমূহকে এবং ইন্দ্রিয়বৃত্তি চরিতার্থের আকাঙ্ক্ষাকে পরাজয় করা সমধিক বীরত্বের কার্য্য। রণ-কুশল বীর পুরুষগণের জীবন অপেক্ষা এই প্রকার সকল লোকের জীবন মানব মণ্ডলী মধ্যে সমধিক পূজনীয়। কারণ ভূপতিগণ পরলোক গত হইলে লোকে ক্রমশঃ তাঁহাদিগকে বিস্মৃত হইয়া যায়। কিন্তু জনহিতৈষী মহাত্মাগণের জীবন স্মৃতিপটে চিরকাল অঙ্কিত রাখিতে মানব মণ্ডলী এক বাক্যে যত্ন করিয়া থাকে। এজন্য এরূপ আকাঙ্ক্ষা করা যায় যে গৌতম, বুদ্ধ, যিশুখৃষ্ট বা শঙ্করাচার্য্যের ন্যায় এই মহাত্মারও জীবন জনসমাজে হিতকর ও আদর্শ বলিয়া পরিগৃহীত হইবে। এই রূপ উদ্যমে কোন অনুনয় করিবার প্রয়োজন নাই, তবে এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে, যে মহাত্মার করুণা এবং উপদেশ সমস্ত সম্মান ও সাদরে গ্রহণ করিয়া থাকি তাঁহার জীবন-চরিত বর্ণনে পরিশ্রম স্বীকার করিতে অন্তরে তৃপ্তি অনুভব করা যায়।

জনৈক গুণানুবাদী।

লাহোর ৩রা জানুয়ারি ১৮৮০।

যোগী ঋষিগণ কিরূপে আশ্রম মধ্যে জীবন অতিবাহিত করেন।

যেমন আমাদিগের গুরুদেবের দুই শত বৎসর বয়স সত্ত্বেও আশী বৎসর বলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ যোগী ঋষিগণ যত কাল ইচ্ছা জীবন্মুক্তি বা সমাধি অবস্থায় এই শরীরে অবস্থিতি করেন। পরিশেষে এই শরীরকে স্বয়ম্ভূ মহালিঙ্গ আকারে পরিণত করিয়া তাঁহাদিগের আত্মা পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়। এইরূপ অনেক প্রস্তরময় লিঙ্গ দেহ আমাদিগের আশ্রমে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারা পূতাত্মা ঋষিদিগের ঐ রূপ পরিণমিত দেহ ব্যতিরেকে আর কিছুই নয়। কোন কোন দেহ অবিকৃত ও অপূতিভূত অবস্থায় রহিয়াছে। তাঁহাদিগের আত্মা পরমাত্মাতে লয় হইলেও দেহ সেই ভাবেই থাকে। এই প্রকার নির্ব্বিকল্প সমাধি বিশিষ্ট যোগিদিগের দেহও আমাদিগের আশ্রমে রহিয়াছে।

পুণ্যাত্মা অগস্ত্য মুনি আমাদিগের আশ্রমের অবস্থাপক। সামাজিক কাল গণনানুসারে তিনি অনেক সহস্র বৎসর পরলোকগত হইয়াছেন, কিন্তু তাঁহার অন্যান্য সমকালিক ঋষিদিগের সহিত এখনও জীবিত রহিয়াছেন। তিনি ঐ পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশে এক গহ্বর মধ্যে বাস করেন। ঐ গহ্বরের প্রবেশ-দ্বার তিন ফিট উচ্চ এবং এক ফুট প্রস্থ। যে সকল যোগিরা এক্ষণে ঐ গহ্বরের চতুর্দ্দিকে অবস্থিতি করিতেছেন, তাঁহারা পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যে একবার করিয়া দর্শনার্থ গমন করেন। অন্য সময়ে ঐ গহ্বরে যাওয়া যায় না, যদি কোন যোগী বিশেষ প্রয়োজন বশতঃ

যাইতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাকে পক্ষিরূপ ধরিয়া গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসরের পর নিরূপিত দিনে আশ্রমের সকল যোগিগণ সমবেত হইয়া যথা প্রণালী ক্রমে গমন করিলে দ্বার আপনা হইতে উদ্ঘাটিত হইয়া যায়, তখন যোগিগণ সেই ভূতপাবন মহর্ষির পদতলে প্রণিপতিত হইলে মহর্ষি তাঁহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিয়া তৎকালিন তত্রত্য সকল ব্যাপার প্রকাশ করিতে নিষেধ করিয়া দেন। সকল শাস্ত্র বেদ এবং অন্যান্য সকল গ্রন্থ যাহা এখন লুপ্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে, তাহা সমস্তই ঐ গহ্বর মধ্যে সুরক্ষিত হইয়া রহিয়াছে, কিন্তু পুণ্যাত্মা মহর্ষি আমাদিগকে সেই সকল গ্রন্থ দেখিতে এবং তল্লিখিত সকল বিষয় মানব মণ্ডলী মধ্যে প্রচার করিতে অনুমতি করিলেন না, কারণ, তাহার কাল উপস্থিত হয় নাই।

আমাদিগের স্বামী মহাশয় তাঁহার আশ্রমস্থ এক জন যোগী দ্বারা যে অদ্ভুত ঘটনা সম্পাদিত হইয়াছে বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

১৮০ বৎসর গত হইল এক জন যোগী তীর্থ দর্শনে যাত্রা করিয়া মহীশূর প্রদেশের মধ্য দিয়া গমন করিতে করিতে তথাকার রাজার সহিত সাক্ষাৎ করণাভিলাষে রাজ-সমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজা তাঁহাকে সসম্ভ্রমে অভ্যর্থনা করিয়া অতিথি সৎকার করিলেন, এবং অগস্ত্য-আশ্রমে অন্যান্য যোগিগণকে সম্মান করিবার অভিলাষে তিনি আপনাকে তথায় লইয়া যাইবার কারণ যোগিবরকে অনুনয় করিলেন। ইত্যবসরে আরকটের নবাব মহীশূরের রাজার সহিত সাক্ষাৎ করিবার মানসে

তথায় উপনীত হইলেন। তাঁহারা সকলেই ঐ যোগীর সহিত অগস্ত্য-আশ্রমে গমন করিলেন। রাজা আশ্রমবাসী পুণ্যাত্মা যোগিদিগের নিরতিশয় সম্মান প্রদর্শন করিলেন। কিন্তু বৈধর্ম্মী প্রযুক্ত নবাব তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনাদিগের এমন কি শক্তি আছে যে আপনারা ঈশ্বরীয় মান আপনাতে আরোপ করেন? আপনাদিগের এমন কি গুণ আছে যে আপনারা আপনাকে ঈশ্বর তুল্য বলিয়া বিবেচনা করেন?" তাহাতে একজন যোগী উত্তর করিলেন "হাঁ আমাদিগের সম্পূর্ণ ঐশীশক্তি আছে, ঈশ্বর যাহা করেন তাহা আমরা করিতে পারি।" এই বলিয়া তিনি এক গাছি যষ্টি গ্রহণ পূর্ব্বক তাহাতে ঐশীশক্তি স্থাপন করিরা আকাশে নিঃক্ষেপ করিলেন। আকাশে নিঃক্ষিপ্ত হইবামাত্র যষ্টিটি লক্ষ লক্ষ শরের আকারে পরিণত হইয়া অরণ্যের বৃক্ষ শাখা সমস্ত খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে লাগিল, আকাশ মধ্যে ভয়ঙ্কর অশনি ধ্বনি গর্জ্জিয়া উঠিল, বিজলী চমকিতে লাগিল, নভোমণ্ডল ঘন ঘটায় আবৃত হইয়া উঠিল, ভূভাগ এককালে নিবীড় তমসাচ্ছন্ন হইল, এবং স্রোতঃ ধারায় বারি বর্ষণ হইতে লাগিল। সমস্ত বন অগ্নিময়, মুহুর্ম্মুহুঃ বজ্র ধ্বনিতে ধরাতল কম্পিত এবং বৃক্ষ সমূহের মধ্যে ঝঞ্ঝা বায়ু বিকট শব্দে প্রবাহিত হইতে লাগিল, প্রলয় অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। এই দুর্যোগ কালে যোগীর স্বর শ্রুতি গোচর হইল। তিনি কহিলেন "যদি আর অধিক শক্তি সংযোজিত করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবী ধ্বংস হইয়া যাইবে।" রাজা ও নবাব ভয়ে সাতিশয় বিহ্বল হইয়া, এই ভয়ঙ্কর বিস্ময়জনক ব্যাপার আর অধিক কাল থাকে এরূপ ইচ্ছা করিলেন না। তাঁহারা এই বিশ্ব-সংহারক

ব্যাপার সম্বরণ করিবার কারণ যোগিরাজকে অনুনয় করিলেন। যোগিবর ইচ্ছা করিলেন—ঝঞ্চা-বায়ু, বজ্রপাত, বৃষ্টি সমস্ত নিবৃত্তি পাইয়া আকাশ মণ্ডল পূর্ব্বের ন্যায় প্রশান্ত ভাব ধারণ করিল। যোগিদিগের যে ঐশি শক্তি আছে তদ্বিষয়ে নবাবের বিলক্ষণ প্রতীতি জন্মিল। তিনি তাঁহাদিগের সম্মানের কারণ আশ্রমে কিছু অর্থ প্রদান করিতে অভিলাষ করিলেন। তাহাতে যোগী কহিলেন "আমরা ফল মূলাশী আমাদিগের অর্থে প্রয়োজন কি ?" তিনি এই কথা বলিয়া নবাবকে ও রাজাকে গহ্বর মধ্যে লইয়া গেলেন, এবং রাশি রাশি চন্দ্রকান্ত সূর্য্যকান্ত নীলকান্ত প্রভৃতি বহুমূল্য প্রস্তর সমূহ এবং স্তূপাকার স্বর্ণ ও রজত প্রদর্শন করিয়া কহিলেন "এই সকল ভ্রান্তিময় ঐশ্বর্য্য আমি তোমাদিগকে দেখাইবার নিমিত্ত এখন সৃষ্টি করিলাম—তোমাদিগের দানে আমাদিগের প্রয়োজন নাই, আমরা যে মুহূর্ত্তে যে স্থানে, ইচ্ছা মাত্রই এই সকল রত্ন পাইতে পারি। আমরা ইচ্ছামাত্র এত ধন সৃষ্টি করিতে পারি যে তোমরা সমস্ত জীবনে তাহা সঞ্চয় করিতে পার কিনা সন্দেহ"। এই বলিয়া তিনি এই সকল ব্যাপার গোপন রাখিতে আদেশ করিয়া তাঁহাদিগকে বিদায় দিলেন।

আত্ম-শোধন।

ওহে পাপিগণ, হও হে মগন,
পরমাত্ম-ধন প্রেমের নীরে।
করহ যতন, তাঁহারি মতন,
অমল রতন হবার তরে॥

নীচ পাপাশয়, তব রিপুচয়,
কর তাহে জয়, যতন করে।
ঘুচিবে হে পাপ ঘুচিবে হে তাপ
ভাসিবে হে সদা সুখের নীরে ॥
আশার আশায়, তোমার হৃদয়,
যাবৎ শোধিত নাহিক হয়।
অভিনব ভাবে, ভাবিত এ জীবে,
সেই পরশিবে না কর লয় ॥
যাবৎ এজীব, করিতে সজীব,
পাপরাশি তব নাশের তরে।
অমৃতের সিন্ধু, সেই কৃপা বিন্দু,
নাহিক বরষে তোমার শিরে ॥
যাবৎ কুমতি, মায়ার আবৃত,
অপস্মৃতি চিতে নাহিক হয়।
সংসার-স্বপন, ভ্রান্তি দরশন,
যাবৎ চেতনে লাগিয়ে রয় ॥
যাবৎ জীবনে, সেই সত্য ধনে,
পরমাত্ম- সনে না হয় দেখা।
প্রশান্ত মূরতি, নিরমল অতি,
তেজোময় কিন্তু সুধায় মাখা ॥
তাহাতে এ চিত, হয়ে সমাহিত,
নাহিক যাবত মগন হয়।
চিত্ত চিত্রকরী, চেতন উপরি,
সংসার-লহরী আঁকিতে রয় ॥

ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডলে, ভয়াকুল স্থলে,
আপনার ভুলে ভ্রমিতে হবে।
পশুপক্ষি প্রাণি, ভ্রমি নানা যোনি,
না জানি কত না যাতনা পাবে॥
জনমে মরণ, মরণে জনম,
হবে পুনঃ পুনঃ এই সে ভবে।
তাই বলি জীব, সেই পরশিব,
জান তবে ভব যাতনা যাবে॥
সুখের কামনা, পাপের কল্পনা,
সে বাসনা শুধু যাতনা সার।
চল সত্য পথে, ভক্তি লয়ে সাথে,
ভব জলধিতে হবে হে পার॥

প্রস্তাবনা।

যে উপায়ে পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্য হয় এবং সেই জীবাত্মা স্বয়ং পরমাত্মারূপে পরিণত হয় তাহাই প্রদর্শন করা এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।—যে ইংরাজী গ্রন্থ হইতে এইটি অনুবাদ করা হইয়াছে সেই ইংরাজী গ্রন্থে গ্রন্থকার ভাষার সৌন্দর্য্য প্রদর্শনে যত্ন না করিয়া কেবল মাত্র বেদান্ত এবং যোগ-বিজ্ঞানের সার-তত্ত্ব সকল পরিষ্কার ভাবে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তবে বেদান্তের ভাব সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করিবার পক্ষে ইংরাজী ভাষায় উপযুক্ত শব্দ না থাকায় গ্রন্থকার সাধারণের শ্রুতি-বিসদৃশ শব্দ সকল ব্যবহার করিয়াছেন। দীর্ঘকাল সমাধি-যোগ অভ্যাস করিয়া গ্রন্থকারের তদ্বিষয়ে যে অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে তদ্দ্বারা তাঁহার এই মাত্র প্রতিপন্ন করিবার অভিলাষ যে একাগ্রতা, ধৈর্য্য এবং বিশ্বাসের সহিত এই গ্রন্থ-লিখিত উপায় অবলম্বন করিলে নিশ্চয়ই পরমাত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।

এই ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে এক মাত্র সত্য, এক মাত্র ধর্ম্ম, এবং একমাত্র ধর্ম্মাশ্রয়, বেদান্ত বাক্য। সেই বেদান্ত বাক্যের পরিষ্কার ভাব জীবের হৃদয়ঙ্গম হইবার কারণ এস্থলে বেদান্ত মতের বিস্তার বিবরণ বলা যাইবে। অন্যদেশীয় নীতি উপদেশ ও তাঁহাদিগের সাধু-প্রণিত ধর্ম্মগ্রন্থ সকল, ভারতের ঋষি, মুনি, যোগী এবং জ্ঞানীগণ প্রণীত

চারি বেদ অষ্টাদশপুরাণ, এবং অন্যান্য গীতাসমূহ যাহা এক্ষণ পর্য্যন্ত হস্তাক্ষর লিপিতে রক্ষিত হইয়াছে, সেই সকলের সহিত তুলনা করিলে, এইরূপ সিদ্ধান্তই হইয়া থাকে, যে অনন্ত আত্মাকে প্রত্যক্ষ করিবার উপায় সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে একাল পর্য্যন্ত কেবল মাত্র আর্য্যরাই জানিয়াছেন।

মানব যে কিছু শুভাশুভ কর্ম্ম করেন বিশ্ব-বিধাতা সন্নিধানে তাহার ফল প্রাপ্ত হইবেন। এই কর্ম্মফলের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিবার জন্য আর্য্য-শাস্ত্র সমস্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে অধ্যয়ন করা কর্ত্তব্য। আর্য্য-শাস্ত্র সকল নিম্ন-লিখিত চারিভাগে বিভক্ত করা যায়ঃ—

(১) বিবেক-শাস্ত্র। এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়নে শৌচাচার, নীতিজ্ঞান, ধর্ম্মজ্ঞান, এবং ন্যায্যান্যায্য বোধ জন্মে।

(২) তত্ত্ব-শাস্ত্র। মায়া বা ভ্রান্তি সহকারে কিরূপে ভূত-তত্ত্ব সমস্ত আত্ম-তত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া এই ব্রহ্মাণ্ড প্রকাশ করিল এই শাস্ত্রে তাহাই জানা যায়।

(৩) ভক্তি-শাস্ত্র। এই শাস্ত্র অধ্যায়নে, জীবাত্মাকে পাপ হইতে বিমুক্ত করিবার উপায় এবং একাগ্রতা, স্তুতি, ঈশ্বর-পরায়ণতা, ভক্তি এবং চিন্তার দ্বারা কিরূপে সম্পূর্ণ আত্ম-তত্ত্ব লাভ করা যায় তাহা জানা যায়।

(৪) জ্ঞান-শাস্ত্র। এই শাস্ত্র অধ্যয়নে বৈদান্তিক যোগাভ্যাসের জ্ঞান জন্মে, তাহাতেআত্ম-সাক্ষাৎকার লাভ হয় এবং জীবাত্মা পরমাত্মা রূপে পরিণত হয়েন।

যাঁহারা যোগাভ্যাসের দ্বারা মোক্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষা করেন তাঁহাদিগের এই সকল শাস্ত্র অধ্যয়ন করা নিতান্ত প্রয়োজন।

নির্ম্মল হইবার কারণ জীবাত্মার একাগ্র বাসনা।

ভূত-তত্ব সহবাসে আত্মার যে স্থূলভাব জন্মে অর্থাৎ বাসনায় আশক্ত হইয়া আত্মাতে যে অহং ভাব জন্মে, তাহা দূর করণার্থ বিচারের দ্বারা অবিকৃত নির্ম্মল পরমাত্মার শক্তি অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য। জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিভা বা জ্যোতি মাত্র। সেই জীবাত্মা একাগ্র সত্যানুসন্ধায়ী শিষ্য, এবং ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই গুরু বা উপদেষ্টা।

যাঁহার নাম মাত্রে রাজাধিরাজগণেরও মস্তক অবনত হইয়া পড়ে, সেই বিশ্ববিধাতার এই বিশাল বিশ্ব-সংসারের অতি ক্ষুদ্র প্রান্তে অবস্থিত হইয়া, জীবনরূপ মুহুর্ত্তকালের জন্য রাজভোগ্য সুখ সমূহ, কামিনীগণের স্মর-সন্দীপনী লাবণ্য-জনিত সুখ এবং অন্যান্য ইন্দ্রিয়-জনিত সুখ, ইত্যাদি জগতের সকল প্রকার সুখ সাতিশয় লোলুপতা সহকারে সম্ভোগ করিয়া, অর্থোপার্জ্জনের জন্য প্রাণপণে যত্ন পাইয়া, অস্থির বিকৃত চিত্ত-জনিত মনে যে সকল অভিলাষ জন্মে, সেই সকল অভিষ্ট সাধনে আত্মাকে উৎসর্গ করিয়া, সংক্ষেপতঃ কি ইন্দ্রিয়-জনিত সুখ, কি চিত্ত-জনিত সুখ, এই সংসারে সমুদায় সুখ সম্ভোগ করিয়া, পরিশেষে তৎসমুদয় অসার জানিয়া; এবং ইহ পরলোকে ধর্ম্ম ও সত্যের মূলতত্ত্ব সম্যক্ অবগত হইয়া পরোক্ষ এবং অপারক জ্ঞানের গভীর ও প্রশান্ত উচ্চতম সীমায় আরোহণ করিলে, জীবাত্মার এই সিদ্ধান্ত হয় যে এই সংসারের কোন সুখই নিত্য ও স্থায়ী নহে। এইরূপে সংসার সুখ-সম্ভোগে বিরাগ উপস্থিত হইলে,

জীবাত্মা সাতিশয় খিন্ন হইয়া অকপটে এই প্রকারে আক্ষেপ করিতে থাকেন :—

হায়! আমি হতভাগ্য! একাল পর্য্যন্ত শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তি সকলের অপব্যবহার করিয়াছি। পরমাত্মার অগ্রে অবনত হওয়াই যাহার কর্ত্তব্য, সেই মস্তক স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করে নাই। এই নেত্রদ্বয়কে অনন্তাত্মা ব্রহ্মের অনুসন্ধানে কখন নিয়োগ করি নাই, এবং অন্তঃকরণ রূপ মন্দির হইতে যে আত্ম-জ্যোতির রশ্মি নিঃসৃত হইয়া মানবের অন্তঃকরণ বৃত্তিকে ও অন্ত-রের গূঢ়-ভাব সমুদয়কে আলোকিত করে সেই বিশ্বপাবন আত্মাকে দর্শন করিবার জন্য মনোরূপ দৈবী দৃষ্টি কখনও অন্তরে উন্মীলন করি নাই। এই নাসারন্ধ্র, নীতিরূপ লতার ধর্ম্ম ও সত্য-পরায়ণতা রূপ কুসুমের সৌরভ গ্রহণ করাই যাহার কর্ত্তব্য সেই নাসারন্ধ্র দুরদৃষ্ট বশে কেবল এই জগতের অনিত্য পুষ্পের গন্ধে মুগ্ধ হইয়াছে, যে পুষ্প অদ্য প্রস্ফুটিত হইয়া কল্যই শুষ্ক হইয়া যায়। যে উপদেশানুসারে লোকে ঈশ্বর-পরায়ণতা ও ধর্ম্মের পথে বিচরণ করে, যে উপদেশানুসারে ঈশ্বরে চিত্ত সমা-হিত করিতে এবং সকল সত্যের দ্বারা জ্ঞান-ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে শিক্ষা করে, ঈশ্বরের সেই সকল উপদেশ সংগ্রহ করাই শ্রুতি যুগলের কর্ত্তব্য কর্ম্ম, বিবিধ ধর্ম্মের সার শিক্ষা করাই শ্রুতি যুগলের কর্ত্তব্য, অনন্ত আত্মার সহিত জীবাত্মার অভেদ জ্ঞানকে যে ভ্রান্তিদ্বারা আবৃত করিয়াছে তাহাকে দূর করা শ্রবণেন্দ্রিয়ের কর্ত্তব্য, কিন্তু শ্রবণেন্দ্রিয়দ্বয় সেই সকল কর্ত্তব্য সম্পাদনে নিয়ো-জিত হয় নাই। এই মুখ, ঈশ্বরের পবিত্র নাম নিরন্তর কীর্ত্তন করাই যাহার কর্ত্তব্য, এই সংসার বন্ধন হইতে মুক্তি লাভের

আকাঙ্ক্ষায় ঈশ্বরের গুণানুবাদ যাহার গান করা কর্ত্তব্য, এবং চরিত্র সংশোধন পূর্ব্বক ধর্ম্মানুসারে এবং পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতে জীবগণকে উপদেশ দেওয়াই যাহার কর্ত্তব্য, এই মুখ তপঃ জপ ধ্যান এবং উপাসনা কার্য্য কখন সম্পাদন করে নাই। পরম ব্রহ্মের নিশ্চল প্রশান্ত ও নিষ্কম্প জ্যোতি সমাহিত-চিত্তে দর্শন করিবার জন্য অনন্ত আত্মাতে মনকে নিয়োজিত করি নাই। চিত্তের সকল প্রকার লঘুতা বা মলিন ভাব সংশোধিত করি নাই। চিন্তা-বৃত্তিকে পাপরূপ পঙ্কিল ভূমিতে বিচরণ করিতে নিবৃত্ত করি নাই। এই হস্তদ্বয়, দানের দ্বারা দরিদ্রগণের দুঃখ দূর করাই যাহার কর্ত্তব্য. বিপন্ন জনকে আশ্রয় দেওয়াই যাহার কর্ত্তব্য, অনন্ত আত্মার অগ্রে বদ্ধাঞ্জলি হওয়াই যাহার কর্ত্তব্য, এবং পবিত্রাত্মা জ্ঞানি গুরুদিগের অভাব মোচন করাই যাহার কর্ত্তব্য, আমার সেই হস্তদ্বয় আপনাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে নাই। এই পাদদ্বয়ের কর্ত্তব্য আমাকে সদ্গুরুর অনুসন্ধানে লইয়া যাওয়া, তাহা হইলে আমি আত্ম-সাক্ষাৎকারের উপদেশ এবং সমাধি যোগ অভ্যাস দ্বারা অক্ষয় শান্তি ও আনন্দ লাভের উপদেশ শিক্ষা করিতাম, এবং অন্তরে সদ্গুরু স্বামির দর্শন লাভের জন্য মনের শক্তি ও বৃত্তি সকল রহিত করিবার উপায় শিক্ষা করিতাম, তাহা হইলে আত্মা হইতে আমি ভিন্ন, এই ভাব দূরীভূত হইত। কিন্তু পাদদ্বয় আপনাদিগের কর্ত্তব্য সম্পাদন করে নাই। অমৃতের নিধান সেই অনন্ত আত্মাকে চিন্তা করা এবং পবিত্রতা সত্য ও ধর্ম্মের অনুসরণ করাই যে আমার জীবনের উদ্দেশ্য, তাহা আমি এখনও জানি না। এই অজ্ঞান প্রযুক্তই ইহ পরলোকের অপরিসীম জ্ঞান লাভে আমি বিরত

রহিয়াছি। অতএব এই সমস্ত চিন্তার ফল এই, যে এক মাত্র সত্য বস্তু ব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করাই আমি নিতান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করিতেছি। এই জ্ঞানই মুক্তি—এই জ্ঞানই আত্মার স্বারূপ্য প্রাপ্তি।

জীবাত্মা পরমাত্মার শিষ্যত্ব স্বীকার করেন।

পরিশেষে জীবাত্মা গভীর ও বিশুদ্ধ চিন্তার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া পরমাত্মা গুরুর নিকট উপস্থিত হইবার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করিলেন এবং তাঁহার চরণে প্রণত হইয়া এই রূপ আত্ম পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন।

ওহে স্বামি! দর্শনাতীত অন্তর্যামি সত্য গুরু যোগি! আমার স্বীয় প্রকৃত সত্তার জ্ঞান অন্ধকারে আবৃত, তাহা আলোকিত কর। দেব! তোমা হইতে আমি ভিন্ন, এই ভ্রান্তি ভাব দূর করিয়া তোমার সন্দর্শনের পথ মুক্ত করিয়া দাও। কৃপাময়! তোমার প্রশান্ত নির্ম্মল জ্ঞানামৃত কণা আমার অন্তরে বর্ষণ কর। তাহার জন্য আমি সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। নাথ! তোমার উপদেশ আমার সকল স্মৃতিপটে এরূপ অবিলোপনীয় অক্ষরে লিখিয়া রাখিব, যে সর্ব্বশক্তিমান্ কালও তাহা লোপ করিতে পারিবে না। আমার পাপাচারি মনোবৃত্তি সকলের সহিত, আমি সর্ব্বদাই এই বলিয়া বিতণ্ডা করিয়া থাকি—তোমরাই আমার উপরে এই নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়াছ। অসত্যের প্রসূতি স্বরূপ এই ভ্রান্তি-দর্শন রচনা করিয়াছ, তদ্দ্বারা আমাকে সত্যের পথ হইতে অপসৃত হইয়া অসত্য এবং পাপকূপে পতিত হইয়া এই মলিন

দশা প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। তোমরাই জীব কুলের বিনাশ এবং সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বরের কোপাগ্নিতে পতিত হইবার কারণ। যিনি কৃপারূপ অমৃত-সিন্ধুকণা সকলের উপরে বর্ষণ করিতে প্রস্তুত, সেই করুণানিধান পরমেশ্বরের নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে মনকে তোমরাই বিরত করিয়াছ। ধর্ম্মলতা রোপণ করিয়া মুক্তিরূপ অমৃতময় ফললাভে, এবং তাহার অমৃতময় রস দ্বারা পাপরূপ কুঠারাঘাতে শান্তিলাভে, তোমরাই মানব কুলকে বঞ্চিত করিয়াছ। ঈশ্বরের পবিত্র ভাবে মানবের মন উন্মনীভূত হইবার পক্ষে তোমরাই প্রতিবন্ধক হইয়াছ। তোমরাই এই সংসারের সকল দুঃখের কারণ।—হে নাথ! আমাকে প্রতারণা করিয়াছে বলিয়া আমি সেই সকল অন্তঃকরণ বৃত্তিকে এই রূপে ভৎর্সনা করিয়াছি। অতএব হে সদ্-গুরু স্বামি! আমাকে ত্যাগ করিও না—আমার অন্তরে সত্যের অমৃত রস সঞ্চারিত করিয়া দাও, যদ্দ্বারা আমি কায়মনে তোমার নিয়ম অনুসরণ করিয়া পরিণামে তোমাতেই লয় হইতে পারি।

পরমাত্ম-গুরু জীবাত্মা-শিষ্যকে তত্ত্ব-জ্ঞানের সার উপদেশ করিতেছেন।

জীবাত্মা মোক্ষের নিমিত্ত লালায়িত হইয়া শিষ্যের ন্যায় অকপটে ও একাগ্রভাবে পরমাত্মার সমক্ষে উপনীত হইলে, অনন্তাত্মা তাঁহাকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিয়া এই প্রকারে বেদান্ত এবং যোগ-বিজ্ঞানের উপদেশ দিতেছেন :—

"আমি অনন্ত আত্মা, সকল জীবের অন্তরে অহংভাবে বিরাজ-মান। জীব ভ্রান্তি-বশতঃই আপনাকে আমা হইতে ভিন্ন বলিয়া ভাবে। আমি নিত্য আনন্দ-স্বরূপ, জীবের অক্ষয় সুখ-দাতা—আমি সর্ব্বান্তর্যামী, সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বশক্তিমান্। আমিই সমস্ত জীব—আমি সমস্ত সংসার ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছি। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের জীবন ও আলোক, স্রষ্টা, পাতা, হর্ত্তা, মঙ্গল-কর্ত্তা এবং সর্ব্বাধার। আমার আদেশ যাহারা অবিচলিত ভাবে পালন করে আমি তাহাদিগেরই মঙ্গল করি। সত্যের আলোক, দৈবী-দৃষ্টি এবং বিশুদ্ধ জ্ঞান আমিই তাহাদিগকে প্রদান করিয়া থাকি, এবং পরিশেষে তাহারা আমারই উপদেশানুসারে আমার সাক্ষাৎ-কার লাভ করিয়া আমাতেই লয় প্রাপ্ত হয়। আমি এক মাত্র সমুদয় জীবের সাক্ষী, তন্নিমিত্ত আমি ব্রহ্ম বা পরমাত্মা, তোমার আত্মাই আমি—অথবা আমি অনন্তাত্মাই সকল জীবের আত্মা। যাহারা বেদান্তের মত অধ্যয়ন বা চিন্তা না করিয়াছে, তাহা-দিগের পক্ষে এই ভাব চিত্তে ধারণা করা অতি কঠিন। কিন্তু যাহারা যোগাভ্যাস করিয়া থাকে, যাহারা নির্ম্মল পবিত্র এবং দৃঢ়-চিত্ত—যাহারা এই জগত এবং জগতের সুখ এককালে পরি-ত্যাগ করিয়াছে—ইতঃস্ততঃ বিক্ষিপ্ত অন্তঃকরণের বৃত্তি যাহারা বশীভূত করিয়াছে—যাহারা চিন্তাশীল ও অকপট-হৃদয়—বেদান্ত তত্ত্ব অনুসন্ধানে স্থির-প্রতিজ্ঞ, পরিশ্রমে অকাতর, অবিচলিত ভাবে নীতি অবলম্বন ও সংসারের সকল বিপদ-সম্মুখীকরণে সাহসী—যাহারা জীবনের সকল গর্ব্ব পরিত্যাগ পূর্ব্বক দৃঢ়ভাবে ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জীবন যাপন করে—যাহারা সকল জগদ্ব্যা-পার হইতে বিরত হইয়াছে—যাহারা একাকী নির্জনে দিবানিশি

আত্ম-চিন্তায় মগ্ন হইয়া থাকে—এইরূপে জীবন যাপন করাই যাহারা নিত্য সুখ বলিয়া মনে করে—সংসারের বিবিধ বিঘ্নপাতে যাহাদিগের চিত্ত বিচলিত না হয়, এই সার তত্ত্ব তাহারাই পরিষ্কাররূপে অনুভব করিতে পারে।

তুমিও যে আমার ন্যায় বিশুদ্ধ তদ্বিষয়ে তোমার প্রতীতি জন্মাইবার জন্য তাহার কারণ প্রদর্শন করিতেছি।

আমি এই দেহে বদ্ধ হইবার পূর্ব্বে, অথবা তুমি আমা হইতে ভিন্ন এই স্বপ্ন বা কল্পনা তোমার উদয় হইবার পূর্ব্বে, তুমি নিশ্চয়ই আমাতে ছিলে। ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে এই ভিন্ন-ভাবময় ভ্রান্তি তোমার দূর হইবে। তোমার আত্মাই যে অনন্ত আত্মা—জ্ঞানের প্রথমাবস্থায় এই অদ্ভুত এবং সংশয়-পূর্ণ সমস্যার মীমাংসা করা কঠিন। আমার অনুগ্রহ ও আশ্রয় ব্যতিরেকে এ পর্য্যন্ত কেহই ইহার মীমাংসা করিতে পারে নাই। কেবল শাস্ত্র ও বেদাধ্যয়ন করিয়া এই প্রকৃত জ্ঞান কেহই এ পর্য্যন্ত লাভ করিতে পারে নাই, যাঁহারা আত্ম সাক্ষাৎ-কার করিয়াছেন, যাঁহারা আত্মাতে চিত্ত সমাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন, কেবল সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানী যোগীদিগের বিশুদ্ধ আত্মার অনুগ্রহেই এই জ্ঞান লাভ হইয়া থাকে। এই কারণেই সেই ব্রহ্ম-জ্ঞানী যোগিগণ অন্তরের মলিনতা দূর করিতে এবং পাপ-কুঠারের আঘাতে হৃদয় ক্ষত হইলে তাহা আরোগ্য করিতে সমর্থ। এই সকল মহাত্মারাই জ্ঞান, ভক্তি, একাগ্রতা এবং ধ্যানের দ্বার উদঘাটন করিতে এবং মোক্ষাভিলাষীগণকে পরমাত্ম দর্শনের উপায় প্রদর্শন করিতে সমর্থ। তাঁহাদিগের নিকটেই লোকে আত্মানাত্ম-জ্ঞানের উপদেশ পাইয়া থাকেন। তাঁহাদিগের

নিকটেই পুনঃ পুনঃ জন্ম, মৃত্যু এবং দেহান্তর ধারণের কারণ অবগত হওয়া যায়। অবিকৃত পরমেশ্বরের কিরূপে সৃষ্টি, পালন, সংহার ও মঙ্গল-কর্ত্তৃত্ব এবং সর্ব্বাধারত্ব সম্ভবে এবং এই সকল গুণ বা বিভূতি তাঁহাতে কি ভাবে অবস্থিত, ইহার গূঢ়তত্ত্ব কেবল তাঁহারাই জানেন। অনন্তাত্মা কিরূপে দেহাকারে পরিণত হইলেন, এবং তোমাকে পরমাত্ম-ভাবে পরিণত করিবার জন্য তোমার অন্তর হইতে কি দূর করা কর্ত্তব্য, তাহা তাঁহারাই জানেন। আত্ম সাক্ষাৎকারের সম্পূর্ণ অভিজ্ঞতা যাঁহারা লাভ করিয়াছেন এবং যাঁহারা স্বয়ং ঈশ্বর-রূপে পরিণত হইয়াছেন, সেই পবিত্র মুনিগণ বা জ্ঞানিগণের সহিত যদি তোমার কথন সন্দর্শন হয়, তখন তুমি বুঝিবে যে তোমার (জীবাত্মার) ভিন্ন সত্তার যে ভাব তাহা মিথ্যা, কেবল মায়া বা ভ্রান্তি বশতই ঘটিয়া থাকে। যখন তোমার দ্বাদশ প্রকার আত্ম-শক্তি স্ব স্ব কার্য্য হইতে বিরত হইয়া এককালে বিলুপ্ত হইবে, তখন তোমার ভিন্ন-সত্তার অনুভূতি এককালে তিরোহিত হইবে। তোমার (জীবাত্মার) দ্বাদশ প্রকার অত্ম-শক্তি আমি পরে বর্ণন করিতেছি। তাহার পর আমি তোমার আত্ম-দৃষ্টি উন্মীলিত করিয়া দিব, তাহা হইলে তুমি অনন্ত পরমাত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে পারিবে। কিন্তু অগ্রে নিম্ন-লিখিত আদেশগুলি তোমার পালন করা কর্ত্তব্য।

পরমাত্মা কর্ত্তৃক জীবাত্মার প্রতি বৈরাগ্য ও শৌচাচারের আদেশ।

(১। পত্নী ব্যতিরেকে অন্যস্ত্রীকে, যতই সুন্দরী হউক,

মাতৃভাবে দর্শন করিবে। ভার্য্যার ন্যায় প্রেম-ভাবে কদাচ দর্শন করিবে না।

২। হত্যা করা ও সৃষ্ট বস্তুর মাংস ভোজন করা পাপ বলিয়া জানিবে।

৩। অনন্ত আত্মা যেমন তোমাতে সেইরূপ সর্ব্বজীবে আছেন। অতএব সাবধান, দুর্ব্বাক্য বা অপমানের দ্বারা কাহারও মনঃপীড়া জন্মাইবেনা, ও কাহারও শরীরে আঘাত করিবে না।

৪। তুমি যে দৃষ্টিতে আপনাকে দেখ, সেই দৃষ্টিতে সকলকে দেখিবে। সন্ন্যাসী, যোগী এবং জ্ঞানীদিগকে মানব-মূর্ত্তি বিশিষ্ট ঈশ্বর বলিয়া জানিবে, এবং তাঁহাদিগকে তদনুরূপ সম্মান প্রদান করিবে। বিশুদ্ধ আনন্দ স্বরূপ আত্মোন্মাদনকর ব্রহ্মজ্ঞান ব্যতিরেকে আর কোন মাদক গ্রহণ করিবে না।

৫। ধৈর্য্য সহকারে ক্ষুধা, তৃষ্ণা সহ্য করিবে। কেহ তোমার শারিরীক বা মানসিক পীড়া জন্মাইলে, প্রতিহিংসা বা অভিশাপ ব্যতিরেকে তাহা সহ্য করিবে।

৬। বালকের ন্যায় সরলভাবে থাকিবে, এবং তোমার দ্বাদশবৃত্তি উন্মূলিত করিয়া সম্পূর্ণ প্রশান্ত ভাবে অবস্থিতি করিবে। গুরুর পবিত্র আদেশ ও দৈবী প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া গুরুদ্রোহী হইবে না।

৭। আত্ম-গৌরব, আত্মাভিমান বা আত্মগর্ব্ব এককালে বিস্মৃত হইবে।

৮। যোগাভ্যাসে কৃতকার্য্য হইবার জন্য এবং তোমার দ্বাদশ-বৃত্তির তমোভাব পরাভূত করিবার জন্য সত্ত্ব-গুণী-ভোজন অর্থাৎ অল্প পরিমাণে লঘুদ্রব্য আহার করিবে।

৯। বহুমূল্য বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বসনার্থ চারখণ্ড গ্রহণ করিবে।

১০। সুবর্ণ এবং রত্ন সকলকে ক্রীড়া-পুত্তলী বা সামান্য প্রস্তরখণ্ড বলিয়া বিবেচনা করিবে, এবং মনে মনে তাহাদিগকে পদাঘাত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিবে।

১১। সংসারাড়ম্বরের মধ্যে মনোহর আবস-গৃহ অপেক্ষা অরণ্য এবং গুহার মধ্যে বাস করিবে।

১২। লজ্জাশীল, করুণা-পূর্ণ এবং প্রফুল্ল থাকিবে। দিবা-ভাগে ভোজনাড়ম্বরে এবং রাত্রিকালে প্রমোদ ব্যাপারে আসক্ত হইও না। ঈশ্বরের সহিত মানবের সম্বন্ধ ও তাঁহার প্রতি মানবের কর্ত্তব্য তুমি নিজে প্রদর্শন ও সম্পাদন করিয়া লোককে শিক্ষা দিবে।

১৩। বুদ্ধির দোষ সংশোধন করিতে সঙ্কুচিত হইবে না। বিষয়ের দোষ গুণ বিচার করিয়া অন্তঃকরণের উদ্বেগ দূর করিবে। বৃত্তি ও রিপু সকল দমন করিয়া আত্মাকে ন্যায়পথে রক্ষা করিবে। বাক্যে ও কার্য্যে চিত্তের গুরুতা রক্ষা করিবে, তদ্দ্বারা যেন কাহারও মনঃপীড়া না জন্মে।

১৪। পাপ প্রবৃত্তি হইতে আত্মাকে রক্ষা করিবে। ঈশ্বরে সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকিবে। ইহ পরলোকের মঙ্গল লাভে উদ্বিগ্ন থাকিয়া বিনীতভাবে চিন্তা করিবে।

১৫। কৃতপাপের নিমিত্ত অন্তরে অনুতাপ করিবে। অবিচলিত চিত্তে ধর্ম্ম কর্ম্ম সম্পাদন করিবে। অন্যের সহিত সরল চিত্তে ব্যবহার করিবে। দিবা নিশি স্থিরচিত্তে সতর্ক এবং চিন্তাশীল থাকিবে। নীতি সকল কার্য্যে পরিণত করিবে।

চরিত্র পবিত্র হইবে এবং তোষামোদ পরিত্যাগ করিবে। পরস্ত্রীর প্রতি ব্যভিচার করিবে না, সত্যের নীতি সকল লঙ্ঘন করিবে না। ইচ্ছাপূর্ব্বক জীবনকে বিপন্ন করিবে না এবং রিপু সকল দমন করিবে।

১৬। এরূপ পবিত্র হইবে যেন অন্তর্যামী ঈশ্বরও তোমার দোষ দেখিতে না পান। নিদ্রা, কথন, লিখন, পঠন, ভোজন, পান প্রভৃতি কার্য্যে অধিক সময় ক্ষেপণ করিবে না, কেবল চিন্তায় নিবিষ্ট থাকিবে।

১৭। আত্ম-পরিচালন, সহিষ্ণুতা, বিশ্বাস এবং অভ্যাসরূপ অন্নের সহিত ব্রহ্ম-জ্ঞান ও বৈদান্তিক যোগরূপ ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিবে। ব্রহ্মজ্ঞান ও যোগাভ্যাস বিষয়ে বহুকাল সঞ্চিত অভিজ্ঞতারূপ নবনীত হইতে এই ঘৃত উৎপন্ন হইয়াছে। তত্ত্ব-চিন্তায় চিত্তের সমাধান এবং বুদ্ধি-বৃত্তির পরিচালনা-রূপ দধি হইতে এই নবনীত সম্ভূত। গুরূপদেশ, এবং চারি বেদ, ষড়্‌দর্শন, অষ্টাদশ পুরাণ, গীতা ও সমস্ত উপনিষৎ ও চিত্তশুদ্ধি ইত্যাদিরূপ দুগ্ধ হইতে উক্ত দধি জন্মিয়াছে। তুমি আত্ম-অভ্যাস-রূপ অন্নে এই ঘৃত মিশ্রিত করিয়া ভোজন করিলে পবিত্রতা ও আত্ম-তত্ত্ব-জ্ঞান লাভের পিপাসা ও ক্ষুধার শান্তি হইবে। এত-দ্ব্যতীত লোকের এই সংসারে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ হইতে পরি-ত্রাণের অন্য উপায় নাই। এই মানব জীবন ধারণ করিয়া যে অনুকূল সুযোগ পাইয়াছ তাহাও বৃথা নষ্ট হইবে। রাজযোগই অভ্যাস করিবে, হঠযোগ অভ্যাস করিবে না।

রাজযোগ বিভাগ।

রাজযোগ প্রণালী দুই ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে আত্ম-জ্ঞান ও ব্রহ্ম জ্ঞান বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে, আত্ম-সাক্ষাৎকার ও তদ্দ্বারা জীবাত্মা পরমাত্মাভাবে পরিণত হওয়ার কৌশল বর্ণিত হইয়াছে। এই দুই বিষয়ের বর্ণনায় অনেক সংশয় এবং প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইবে, তাহা তুমি স্বীয় বুদ্ধিবৃত্তি পরিচালনা ও মনঃসংযমের দ্বারা দূর করিবে।

মায়া বা ভ্রান্তি দৃষ্টি।

আত্ম-তত্ত্ব জ্ঞান লাভ করিতে হইলে প্রায় এক সহস্র আটটি সংশয় অগ্রে দূর করিতে হইবে। এই বিবরণটিকে তিন প্রকরণে বিভক্ত করা যায়।

১। দৃষ্টান্তের দ্বারা বিবৃত করণ।

২। পরমাত্মা কিরূপে জীবত্মা-রূপে পরিণত হইলেন তাহার বিস্তার বিবরণ।

৩। জীবত্মা কিরূপে পার্থিব পাশ অর্থাৎ দেহ বন্ধন হইতে বিমুক্ত হইবেন তাহার বিষয়। ইহাই প্রধান উদ্দেশ্য।

প্রথমতঃ দৃষ্টান্তের দ্বারা বিবৃতি করণ। বিবেচনা কর জীবাত্মা পরমাত্মার প্রতিভা বা জ্যোতিমাত্র। মায়ার আবরণ কর্ত্তৃক সেই জীবাত্মা আপনাকে পরমাত্মা হইতে পৃথক বলিয়া অনুভব করেন। সেই আবরণ যদি দূর করা যায়, তাহা হইলে জীবাত্ম', পরমাত্মার সহিত আপনার অভেদ-জ্ঞান লাভ করেন,

যেমন দর্পণের মধ্যে কোন পদার্থের প্রতিবিম্ব পড়িলে বোধ হয় দর্পণের মধ্যে সেই পদার্থ রহিয়াছে কিন্তু বস্তুতঃ তাহার মধ্যে কিছুই নাই; সেইরূপ পরমাত্মার প্রতিভাই (অন্তঃকরণ দর্পণে পড়িয়া) জীবাত্মারূপে (অহংভাবে) প্রকাশ পায়। অন্ধকার রজনীতে সহজেই রজ্জুখণ্ডকে সর্প বলিয়া এবং কাষ্ঠখণ্ডকে তস্কর বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই সেই ভ্রম দূর হয়। পরমাত্মা ও জীবাত্মাও সেইরূপ। বিস্তীর্ণ বালুকাময় ভূমিতে পান্থজন তৃষ্ণার্ত্ত হইলে উজ্জ্বল বালুকারাশিকে জলাশয় বলিয়া তাহার ভ্রম হয়, বস্তুতঃ জল-ভ্রম ব্যতিরেকে তাহা প্রকৃত জল নহে, সেইরূপ জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে পৃথক্‌ভাবে প্রতিভাত হয়। সেইরূপ আত্ম সাক্ষাৎকার হইলে জীবাত্মা (অহংভাব) বা তাহার বিভূতি অর্থাৎ বুদ্ধি, স্মৃতি প্রভৃতি অন্তঃকরণ বৃত্তি কিছুই প্রকাশ পায় না, পরমাত্মার সহিত মিলিত বা তাহাতে লীন হইয়া যায়। সূর্য্য যেরূপ ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত পদার্থকে প্রকাশ করেন সেইরূপ নিত্য অক্ষয় পরমাত্মার অনন্ত জ্যোতির রশ্মি প্রত্যেক জীবকে প্রকাশ করিতেছে। পূর্ব্বোক্ত দৃষ্টান্ত দ্বারা প্রতিপন্ন হইতেছে যে স্বয়ং প্রকাশ পরমাত্মা বা ব্রহ্মচৈতন্যই ভ্রান্তি সহকারে সকল প্রকার কল্পিত বা অসৎ আকারে জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতেছেন। যদি এরূপ তর্ক উপস্থিত করা যায় যে নির্ম্মল ব্রহ্ম-তত্ত্ব কিরূপে এই সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের আকার ধারণ করিলেন, তাহাতে এই প্রত্যুত্তর করা যাইতে পারে যে, যে সকল ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বলিয়া প্রতীয়মান, তাহারা প্রতিভা ভিন্ন বস্তুতঃ কিছুই নহে। যেমন উজ্জ্বল

নির্ম্মল স্ফটিকে বিবিধ প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়, সেইরূপ স্ফটিকে নানাবিধ আকার অবয়ব বর্ণ প্রভৃতি দৃষ্ট হয়, কিন্তু তাহাতে স্ফটিকের প্রকৃত নির্ম্মলতা বা উজ্জ্বলতার কিছু-মাত্র হানি হয় না, সেইরূপ চেতনময় পরমাত্মাতে এই বিবিধ আকার ও বর্ণ বিশিষ্ট বিশ্ব প্রতিবিম্বিত হইতেছে। যেমন সুবর্ণ হইতে নানাবিধ অলঙ্কার প্রস্তুত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হয়,কিন্তু সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন অলঙ্কার বস্তুতঃ সুবর্ণ ভিন্ন আর কিছুই নহে, সেইরূপ এই বিশ্ব পদার্থ যত প্রকারই হউক সেই পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুই নহে। যেমন একটি গৃহ নির্ম্মাণ করিতে হইলে গৃহটি অগ্রে নির্ম্মাতার চিত্তপটে অঙ্কিত হয়, পরে সেই মনোময় গৃহ নির্ম্মাণ শক্তির দ্বারা দৃশ্যময় আকারে পরি-ণত হয়, সেইরূপ চেতনময় আত্মার ভাবনা বা কল্পনাতে এই ভিন্ন ভিন্ন সত্ত্বা-বিশিষ্ট বিশ্ব অগ্রে উদয় হইয়া, পরে সেই সকল ভাবনা-ময় সত্ত্বা বাহে দৃশ্যময় আকারে পরিণত হইয়াছে।

এক্ষণে দ্বিতীয় প্রকরণ অর্থাৎ পরমাত্মা কিরূপে জীবাত্মা-রূপে পরিণত হইলেন তাহার মীমাংসা করা যাইতেছে। যিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বান্তর্য্যামী ইন্দ্রীয়াতীত সর্ব্বদ্রষ্টা বিশুদ্ধ একমাত্র সাক্ষি-স্বরূপ, সেই শিবময় বিরাটরূপা সর্ব্বাত্মাই তোমার মস্তকে (সহস্রার মধ্যে) অধিষ্ঠিত। সহস্রারে বা মস্তকের মধ্য-স্থলে সেই সর্ব্বাত্মাই পরমাত্মারূপে বিরাজমান। অতএব আমিই এই দুই বিভিন্ন অবস্থায় বা ভাবে লক্ষিত হইতেছি,— (১) নিষ্ক্রিয় পরমাত্মভাব, যাহা কেবল সাক্ষি স্বরূপ, ইহা আমার নিবৃত্তিভাব। (২) জীব ও বিশ্বাকারে পরিণত হইয়া

এই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি, স্থিতি সংহার-কার্য্য সম্পাদন করি-তেছি,—ইহা আমার প্রবৃত্তি-ভাব।

কল্পনা ও ভ্রান্তি সহকারে তত্ত্ববৃত্তির উপদেশ।

সম্পূর্ণ বিভূতি-বিশিষ্ট সেই সর্ব্বাত্মাকে পরমাত্মা বলিয়া তোমার, সহস্রারের কুটীর মধ্যে অবতারিত করিতেছি। তোমার ব্রহ্মরন্ধ্র (মস্তিষ্ক মধ্যস্থিত ছিদ্র) হইতে সুষুম্না নাড়ীর মধ্য দিয়া কুণ্ডলীতে ইহা অবতরণ করিলেন। এই নাড়ীর অভ্যন্তরে আত্ম-শক্তি বা জীবতত্ত্ব প্রবাহিত হয়। এই নাড়ী ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অবতরণ করিয়া নেত্রদ্বয় ও নাসিকাদ্বয়ে সং-যোজিত হইয়া, অধোভাগে গমন পূর্ব্বক গলনলীর নিকটে অন্নবাহি স্রোতঃপথে প্রবিষ্ট হইয়া, সেই স্রোতঃপথের মধ্য দিয়া লিঙ্গমূলে কুণ্ডলীতে (চিত্র সংখ্যা ১৮। ১৯) সংযোজিত হইয়াছে। পরে বক্রভাবে ঊর্দ্ধমুখ হইয়া মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার ব্রহ্মরন্ধ্রে (চিত্র ৩০) পর্য্যবসিত হইয়াছে। সুষুম্না নাড়ীর যে ভাগ কুণ্ডলী হইতে মেরুদণ্ডের মধ্যে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে গমন করিয়াছে তাহার নাম কুম্ভক নাড়ী।

এই সুষুম্নাতে তিনটি সূক্ষ্ম নাড়ী একত্র গ্রথিত আছে। ইহার মধ্যে জীবাত্মার (সূক্ষ্ম শরীরের) প্রাণ অধোমুখে এই তিন পথে প্রবাহিত হইতেছে (চিত্র সংখা ১। ২। ৩)। প্রথম অংশের নাম সুষুম্না-যন্ত্রের ইড়াকলাবশী, দ্বিতীয় অংশের নাম সুষুম্না-যন্ত্রের সুষুম্না-বশী এবং তৃতীয় অংশের নাম সুষুম্না-যন্ত্রের পিঙ্গলাবশী।

মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কুম্ভক যন্ত্রেও ঐ তিন নাড়ী একত্র গ্রথিত। জীবাত্মার প্রাণ এই তিন পথে ব্রহ্মরন্ধ্র অভিমুখে আবাহিত হইতেছে (চিত্র সংখ্যা ৪। ৫। ৬)। চতুর্থের নাম কুম্ভক-যন্ত্রের রেচক চন্দ্রকলাবশী, পঞ্চম, কুম্ভক-যন্ত্রের কুম্ভক অগ্নিকলাবশী, ষষ্ঠ —কুম্ভক-যন্ত্রের পূরক সূর্য্যকলাবশী।

সুষুম্নার পূর্ব্বোক্ত তিন অংশের ছিদ্রমধ্যে যে বিশুদ্ধ আকাশতত্ত্ব প্রবাহিত হয়, তাহা দৈহিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক এই ত্রিবিধ ক্রিয়াশক্তির অধিষ্ঠাতা। প্রথমটি জ্ঞানেন্দ্রিয় বৃত্তির অধিষ্ঠাতা, ইহাকে অধোমুখ ইড়াকলাবশী বলা যায়। তৃতীয়টি পাঞ্চভৌতিক-তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা, ইহার নাম অধোমুখ পিঙ্গলাবশী। দ্বিতীয়টি ভক্তি, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস প্রভৃতি আধ্যাত্মিক-বৃত্তির অধিষ্ঠাতা, ইহার নাম অধোমুখ সুষুম্নাবশী।

মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কুম্ভকযন্ত্রে আবাহিত কালে সেই আকাশতত্ত্ব ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়া শক্তির অধিষ্ঠাতা হওয়াতে ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। কুম্ভক যন্ত্রস্থ সুষুম্না নাড়ীর চতুর্থ শিরা বুদ্ধিবৃত্তির অধিষ্ঠাতা, ইহাকে ঊর্দ্ধমুখ রেচক চন্দ্রকলাবশী, এবং অন্তর্মুখ তমোগুণ দৃষ্টি বলা যায়। পঞ্চম, জ্ঞানশক্তির অধিষ্ঠাতা ঊর্দ্ধমুখ কুম্ভক অগ্নিকলাবশী এবং অন্তর্মুখ সত্ত্বগুণ দৃষ্টি বলা যায়। ষষ্ঠ, কল্পনা শক্তির অধিষ্ঠাতা, ইহাকে ঊর্দ্ধমুখ পূরক সূর্য্যকলাবশী এবং অন্তর্মুখ রজোগুণ দৃষ্টি বলা যায়। অত-এব আমার শুদ্ধ আকাশ স্বরূপ, আবাহন ও প্রবাহণ ভেদে দুই আকার প্রকাশিত। প্রথম, সৃষ্টি স্থিতি লয়াত্মিকা অধোমুখী ত্রিগুণাত্মিকা দৈবীসত্তা, অর্থাৎ অধোমুখী সৃষ্টি-স্থিতি-সংহারাত্মক ত্রিজীব-ত্রিগুণাত্মক-বৃত্তি-বিশিষ্ট আকাশ। দ্বিতীয়, নিষ্ক্রিয়

মঙ্গলময়ী মিলনোন্মুখী ঊর্দ্ধবাহিনী ত্রিগুণাত্মিকা দৈবীসত্তা, অথবা ঊর্দ্ধমুখী ত্র্যর্পণ, অনুগ্রহ এবং ঐক্যবৃত্তি বিশিষ্ট ত্রিজীব ত্রিপ্রাণাত্মকালয় আকাশ।

সক্রিয় ও নিষ্ক্রিয় এই দুই অবস্থাভেদে, আমি যে কিরূপে দুই প্রকার ভিন্ন মূর্ত্তিতে অবস্থিত তাহা বর্ণন করিলাম। এক্ষণে ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে আমার অবতরণ কালে যে দ্বাদশ বৃত্তি প্রকাশ হইল তাহা কহিতেছি। এই সকল বৃত্তি ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে কুণ্ডলী পর্য্যন্ত স্থানে স্থানে অবস্থিত। আমি এক সর্গ হইতে অন্য সর্গে অবতরণ করিবার কালে আমার বিভূতি সকল পরিবর্ত্তিত এবং ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়াশক্তি-বিশিষ্ট বিবিধ প্রকার বৃত্তি সমূহ সম্ভূত হইতে থাকে। এই সকল বৃত্তির স্বতন্ত্র সত্তা নাই, তাহারা কেবল আমার পরমাত্ম-তত্ত্বের প্রতিভা মাত্র।

আমার প্রথম সর্গ শিরঃ কপালের মধ্যস্থলে অবস্থিত (চিত্র সংখ্যা ৭)। এই স্থানে আমার নির্ব্বিকার পরমাত্ম-তত্ত্ব হইতে প্রথম বৃত্তি সম্ভূত হইয়াছে। ইহাই আমার প্রথম প্রতিভা বা প্রথম অবতার। ইহাকে চিৎতত্ত্ব-বৃত্তি বা চিন্ময়তত্ত্ব-বৃত্তি বা বিজ্ঞানাত্মা বলে। ইহা কেবল মাত্র সর্ব্ব সাক্ষি স্বরূপ অন্তর্য্যামী, দ্বৈত জ্ঞান বর্জ্জিত, অনন্ত আত্ম-তত্ত্বের সহিত অভেদ জ্ঞান পূর্ণ। অথবা ব্রহ্ম-জ্ঞান আত্ম-জ্ঞান অখণ্ড অভেদ ঐক্য অদ্বৈত যথার্থ পরাৎপরময়। এই পরাৎপর অতি নির্ম্মল নিশ্চল ব্রহ্ম-স্বরূপ বা অনন্ত আত্মতত্ত্ব। ইনি কোন ক্রিয়া করেন না অথবা সৃষ্টিও করেন না অথচ সর্ব্বত্রব্যাপী দর্শনাতীত সর্ব্বশক্তিমান্ সর্ব্বান্তর্যামী সর্ব্বদ্রষ্টা অক্ষয় আনন্দ স্বরূপ, ইহা কেবল সাক্ষী স্বরূপ অনন্তাত্মা। ইহাই আমর প্রথম তত্ত্ব, ইহাই স্বয়ংপূর্ণ ও নির্ব্বিকল্প।

২। আমার দ্বিতীয় সর্গ মস্তিষ্কের উপরিভাগে অবস্থিত চিত্র সংখ্যা ৮) ইহাকে কপাল-মধ্য-ব্রহ্মরন্ধ্র বলে। এই স্থানে অনন্ত আত্মতত্ত্ব হইতে আমার দ্বিতীয় বৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহা আমার দ্বিতীয় প্রতিভা বা অবতার, ইহাকে বুদ্ধিতত্ত্ব বলে। এই স্থানে অন্তর্যামী সাক্ষী চৈতন্য ও জীবচৈতন্যের ভেদ-জ্ঞান উৎপত্তি হয়. এই স্থান হইতেই মায়া, সংকল্প, কল্পনা এবং ভ্রান্তি-রূপ প্রলোভন জাল বিস্তার করিতে আরম্ভ করেন। এই স্থান হইতে দ্বৈত ভাব আরম্ভ বা এই স্থানে পরমাত্মা-জীবাত্মার দ্বৈত বিবেক সন্দেহ অন্যথার্থ-পরময়ভাবের অবস্থান। ইহাই জীব-চেতন, যাহা দ্বারা সৃষ্টি-আদি কার্য্য হইতেছে। সহসা সন্দেহ বা অবিশ্বাস জন্মিয়া আপনাকে অপবিত্র না করে তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকাই ইহার বৃত্তি বা কার্য্য। অন্তর্য্যামী চিদাত্মার ন্যায় ইহাও নির্ম্মল, অবিনাশী ও নিত্য আনন্দময়। ইহা অনন্ত আত্মার প্রবাহিকা তত্ত্বের ইচ্ছা ও নিয়ম সকল প্রতিপালন করেন।

৩। আমার তৃতীয় সর্গ মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে (চিত্র সং ৯)। ইহাকে মস্তক-মধ্যঃ-দীর্ঘনুৎপা-বিবেক-প্রকাশ কমল বলে, এই স্থানে আত্মতত্ত্ব হইতে আমার তৃতীয় বৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহাই আমার তৃতীয় প্রতিভা বা অবতার। ইহাকে জ্ঞান শক্তি বা জ্ঞানবৃত্তি বলে। এই স্থানে আত্মতত্ত্ব হইতে সহসা প্রেম বা আসক্তিভাব প্রাদুর্ভূত হইয়া, অবিশ্বাস ও পাপ প্রবর্ত্তিত করে। এই স্থানে জীবাত্মা ত্রিগুণাত্মকভাবে পরিণত হয়েন। এই স্থানেই চিত্ত-বৃত্তির আবির্ভাব, যাহাকে মিথ্যা সংকল্প অন্যথার্থ প্রতি-পালিত প্রতিবিম্ব ছায়া বা তৎপরময় বলে। ইহার পর উত্তরো-ত্তর যে সকল বৃত্তি প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, তাহাদিগের শুভাশুভ

কর্ম্মের সাক্ষী স্বরূপ ও তাহাদিগের সহানুভূতি করাই ইঁহার কার্য্য। ইহা প্রথমতঃ জীবকে পাপ হইতে নিবর্ত্তিত করিবার জন্য এবং দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য চেষ্টা করে। ইহা বা এই বৃত্তি অপরাপর বৃত্তি সকল অনন্ত আত্মতত্ত্বের নিয়ম ও ইচ্ছা পালন করিয়া ধর্ম্মতঃ ন্যায়ানুগতভাবে ও অকপটভাবে কার্য্য করিতে প্রবর্ত্তিত করে।

৪। চতুর্থ সর্গ মস্তিষ্কের অধোভাগে অবস্থিত (চিত্র সং ১০)। এই স্থানে আত্মতত্ত্ব হইতে আমার চতুর্থ বৃত্তি প্রতিভা বা অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহাকে প্রজ্ঞাবৃত্তি বলে। এই স্থানেই অনিত্য সুখের বাসনা এবং আসক্তির উৎপত্তি। সেই অনিত্য সুখই নিত্যসুখ বলিয়া বিবেচিত হয়। সেই সকল সুখ নিদ্রিত জীবের স্বপ্নের ন্যায় মিথ্যা ও ক্ষণিক। এই স্থানে ত্রিগুণাত্মক জীব অজ্ঞানত্মক ভাবে অর্থাৎ অজ্ঞান-অন্ধকারে আবৃতের ন্যায় প্রকাশ পায়। আত্মতত্ত্বের নিয়ম ও ইচ্ছা পালন করিয়া আত্মাকে পাপ ও অসত্য হইতে রক্ষা করা এই বৃত্তির কার্য্য।

৫। আমার পঞ্চম সর্গ ললাটের মধ্যে অবস্থিত (চিত্র নং ১১)। এই স্থানে আত্মতত্ত্ব হইতে আমার পঞ্চম বৃত্তি প্রতিভা বা অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহার নাম স্মৃতি বৃত্তি। এই স্থানে স্মৃতি, বিস্মৃতি ও প্রস্তাবনা-বৃত্তির উৎপত্তি। এই স্থানে অজ্ঞানান্ধ জীবের অধিষ্ঠাতা, অহংভাবের অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হয়েন। এই বৃত্তি মহাতত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া ইচ্ছানুসারে আপনাতে যে কোন বস্তু রচনা করেন, এবং মদাহঙ্কারের বশবর্ত্তী হইয়া তাহা আপনাতেই রক্ষা করেন,

এবং মহামায়ার প্রভাবে পুনরায় তাহা বিস্মৃত হয়েন। জন্মান্তর গ্রহণ করিয়া পাপ পুণ্যের ফল এই বৃত্তির দ্বারাই ভোগ হইয়া থাকে এবং এই বৃত্তি অতি সাবধান ও বিবেচনার সহিত আমার নিয়ম ও ইচ্ছা পালন করেন।

৬। আমার ষষ্ঠ সর্গ ভ্রূদ্বয় মধ্যে অবস্থিত (চিত্র সং ১২)। এই স্থানে আত্মতত্ত্ব হইতে আমার ষষ্ঠ বৃত্তি বা প্রতিভা বা অবতার প্রাদুর্ভূত হয়। ইহাকে চিন্তা-বৃত্তি বা চিত্ত-বৃত্তি বলে। মিথ্যা কল্পনা বা কবিদিগের কল্পিত রচনার ভাব সমুদয় এই স্থানে অহং-জ্ঞানের অধিষ্ঠাতা ভাববৃত্তির অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হয়েন। এই বৃত্তি স্বীয় আবরণ ও বিক্ষেপ শক্তির দ্বারা চিত্তের ভাবসমূহকে প্রকৃত পথে চালিত করে। ইহা মাধুর্য্য ও সহিষ্ণুভাবে আমার নিয়ম ও ইচ্ছা প্রতিপালন করে।

৭। আমার সপ্তম সর্গ নাসাগ্রে অবস্থিত (চিত্র সং ১৩)। এই স্থানে আত্মতত্ত্ব হইতে আমার সপ্তম বৃত্তি, প্রতিভা বা অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহাকে আত্মগৌরব, আত্মপ্রেম এবং আত্ম-ভ্রান্তি বৃত্তি বলা যায়। এই স্থানে চিন্তা বা চিত্ত-বৃত্তির অধিষ্ঠাতা কল্পনা ও বাসনা-বৃত্তির অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হয়। আত্মাবনমন ও আত্মত্যাগ এবং আপনার ভাব বা অবস্থা বুঝিতে পারাই ইহার কার্য্য। ইহা ধৈর্য্য, নম্রতা ও সন্তোষের সহিত আমার নিয়ম ও ইচ্ছা পালন করে।

৮। আমার অষ্টম সর্গ জিহ্বা মধ্যে অবস্থিত (চিত্র সং ১৪)। এই স্থানে আমার অষ্টম বৃত্তি প্রতিভা বা অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহাকে তমোবৃত্তি, উগ্র, শান্ত প্রভৃতি ভাব-বৃত্তি ও উৎকর্ষ বৃত্তি বলে। তমোবৃত্তির দ্বারা উত্তমরূপে

বিবেচনা না করিয়াই কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়, ভাববৃত্তির দ্বারা ন্যায্যান্যায্য চিন্তা না করিয়া নির্ব্বোধের ন্যায় কার্য্য করে। উৎকর্ষ বৃত্তির দ্বারা ন্যায় এবং যুক্তি অনুসারে কার্য্য করে। এই স্থানে কল্পনা ও বাসনা-বৃত্তির অধিষ্ঠাতা, সত্ত্ব, রজ, তমঃ এই ত্রিগুণময় বিবেচনা বৃত্তিতে পরিণত হয়। প্রশান্তভাব, প্রফুল্লতা, যুক্তিপরায়ণতা, নম্র এবং কোমল প্রকৃতি, এই গুলি এই বৃত্তির ধর্ম্ম। ইহা উৎসাহ, সহিষ্ণুতা ও প্রশান্তভাবে আমার নিয়ম ও ইচ্ছা পালন করে।

৯। আমার নবম সর্গ কণ্ঠমধ্যে অবস্থিত (চিত্র সংখ্যা ১৫)। এই স্থানে আমার নবম বৃত্তি প্রতিভা বা অবতার প্রাদুর্ভূত হয়। ইহাকে বুদ্ধিবৃত্তি বলে। এ স্থানে বিবেচনা-বৃত্তির অধিষ্ঠাতা ব্যবসায়াত্মিকা বা ক্রিয়া-সাধিকা বুদ্ধি-বৃত্তির অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হইয়াছে। এই বৃত্তি চারি অংশে বিভক্ত :—১। উদ্বেগ-বৃত্তি,—লঘু পরিবর্ত্তনশীল এবং হৃদয়ের কুপ্রবৃত্তির সহিত সংস্পৃষ্ট। ২। অন্তঃকরণের বৃত্তি সমস্ত,—ইহারা সন্দেহ, সংশয় ও আশাপূর্ণ, এবং অন্তঃকরণের কুপ্রবৃত্তির সহিত সংস্পৃষ্ট। ৩। আকাঙ্ক্ষা-বৃত্তি,—পাপ-কার্য্য ইহার একান্ত সংকল্প, এবং বাসনা-স্থিত পাপকার্য্যের সহিত ইহা সংস্পৃষ্ট। ৪। গর্ব্ব এবং অনাদর বৃত্তি,—কেবল আত্মসুখের প্রতিই এই বৃত্তির দৃষ্টি। এই সকল বৃত্তি নীরস এবং নির্দ্দয় প্রকৃতির সহিত সংস্পৃষ্ট। এতদ্ব্যতীরেকে এই চারি বৃত্তির প্রকৃত কর্ত্তব্য কার্য্যও নির্দ্দিষ্ট আছে। যথা,—

১। প্রথমা বৃত্তি হইতে সংকল্পের স্থিরতা ও হৃদয়ের নির্ম্মলতার উৎপত্তি। ২। দ্বিতীয়া বৃত্তি হইতে বিশ্বাস,

শ্রদ্ধা এবং অন্তঃকরণের নির্ম্মলতার উৎপত্তি। ৩। তৃতীয়া বৃত্তি হইতে পবিত্র কার্য্য এবং বাসনা নির্ম্মলী-করণের দৃঢ় সঙ্কল্পের উৎপত্তি। ৪। চতুর্থী বৃত্তি হইতে সর্ব্বত্র আত্মভাবে দর্শন এবং সহানুভূতি, সানুকূলতা ও প্রেম, এই সকলের উৎপত্তি। এই সকল বৃত্তি সম্পূর্ণ প্রশান্ত প্রকৃতিতেই জন্মে। এই সকল বৃত্তি আপনাপন কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়াই আমার নিয়ম ও ইচ্ছা পালন করে।

১০। আমার দশম সর্গ হৃদয় মধ্যে অবস্থিত (চিং সং ১৬)। এই স্থানে আমার দশম বৃত্তি, প্রতিভা অথবা অবতার প্রাদুর্ভূত হয়। এই স্থানে অনুরাগ ও বিরাগ প্রভৃতি অন্তঃকরণের ভাব সমুদয় উদয় হয়। এই সকল ভাব অষ্টবিংশতি প্রকার। যথা,—(১) পরস্ত্রীতে ব্যভিচার প্রবৃত্তি, (২) ভোগের অতিশয় লালসা, (৩) জাগ্রত অবস্থার ক্রিয়া এবং সুখের অভিলাষ, (৪) অন্নময় কোশ অর্থাৎ স্থূল শরীরের বৃত্তি সমূহ। (৫) প্রাণিহিংসা বৃত্তি। (৬) ভাণ (আপনাকে অন্যভাবে দেখান,) ও ধনগর্ব্বের বৃত্তি, (৭) প্রতারণা ও বঞ্চনা বৃত্তি, (৮) স্বপ্নাবস্থা (৯) প্রাণময় কোষস্থিত শ্বাস প্রশ্বাসের দ্বারা আত্মরক্ষা বৃত্তি, (১০) সামান্য দোষ, হানি বা অপমানে ক্রোধের প্রবৃত্তি। (১১) কার্পণ্যতা (১২) ইহ পরলোকে সুখ ভোগে অতিশয় লালসা (১৩) সুষুপ্তি বা নিঃস্বপ্ননিদ্রা। (১৪) মনোময় কোশের বৃত্তি সমস্ত। (১৫) পুত্র, কলত্র, জননী প্রভৃতি জগদ্বস্তুর প্রতি অন্তঃকরণের অতিশয় আসক্তি। (১৬) ধন এবং শারীরিক বলজনিত আত্ম-গর্ব্ব ও অহঙ্কার। (১৭) চিত্তের বৈষম্যভাব। (১৮) তূর্য্য অবস্থা। (১৯) জ্ঞানময়-কোশস্থিত অন্তঃকরণ বৃত্তি বা বুদ্ধি

বৃত্তির ঔৎকর্ষ লাভের আকাঙ্ক্ষা। (২০) বিস্ময় ও মোহিনী-বৃত্তি। (২১) আপনার ন্যায় অন্যের অভাব ও কষ্ট দেখিবার আকাঙ্ক্ষা। (২২) একাগ্র বা ধ্যানের অবস্থায় মনের বিশৃঙ্খল ভাব। (২৩) কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পন্ন করিয়া সুখ অনুভব—এইটি আনন্দময় কোশের বৃত্তি। (২৪) ঈর্ষা। (২৫) জগতের মধ্যে কাহাকেও সমকক্ষ জ্ঞান না করা বৃত্তি। (২৬) আত্ম-প্রশংসার আকাঙ্ক্ষা। (২৭) আত্ম-বিশ্বাস বা আত্ম-নির্ভর প্রবৃত্তি। (২৮) গর্ব্ব, লজ্জা বা খ্যাতির অনুরোধে সত্যের বিঘ্ন করা। এই স্থানে বুদ্ধি বৃত্তির অধিষ্ঠাতা, ভাব ও কল্পনা বৃত্তির অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হয়। অন্তঃকরণের ভাব বা রিপু এবং কল্পনার বিপদ হইতে আত্মাকে রক্ষা করাই ইহার কার্য্য। এই বৃত্তি একাগ্র ও বৈরাগ্য সহকারে আমার ইচ্ছা ও নিয়ম পালন করে।

১১। আমার একাদশ সর্গ নাভিমণ্ডলে অবস্থিত। এই স্থানে আত্ম-তত্ত্ব হইতে আমার একাদশ বৃত্তি প্রতিভা অথবা অবতার প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহাকে জ্ঞানেন্দ্রিয়-বৃত্তি বলে। জ্ঞানেন্দ্রিয় বৃত্তি পঞ্চবিধ, যথা,—শ্রবণেন্দ্রিয়, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয় ও ঘ্রাণেন্দ্রিয়। প্রত্যেক জ্ঞানেন্দ্রিয়ের ছয় প্রকার করিয়া শক্তি আছে।

শ্রবণ ও বাগিন্দ্রিয়ের শক্তি যথা,—(১) দূরস্থ শব্দগ্রহণী শক্তি, বাক্-প্রবর্ত্তিনী শক্তি। (২) ভিন্ন ভিন্ন প্রকার শব্দগ্রহণী শক্তি, এবং ভিন্ন ভিন্ন শব্দ-প্রবর্ত্তিনী শক্তি (৩) অজ্ঞাত ভাবে বা অচেতন ভাবে বাক্-প্রবর্ত্তিনী শক্তি, এবং সেইরূপ শব্দ বা বাক্য-গ্রহণী শক্তি। (৪) সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন স্বর গ্রহণী-শক্তি,

ও সঙ্গীতের ভিন্ন ভিন্ন স্বর-প্রবর্ত্তিনী-শক্তি। (৫) বর্ণোচ্চারিণী শক্তি, এবং উচ্চারিত বর্ণগ্রহণী-শক্তি। (৬) সঙ্গীত-শক্তি, এবং সঙ্গীত সুখানুভাবিনী ও তাহাতে চিত্তের একাগ্র বা লয়-বিধায়িনী শক্তি।

স্পর্শজ্ঞান শক্তিও ছয় প্রকার। যথা ;—(১) বেদনানুভূতি শক্তি, (২) সুখানুভূতি শক্তি, (৩) শ্রান্ত্যানুভূতি শক্তি, (৪) বিস্ময়ানুভূতি শক্তি, (৫) শারীরিক বা মানসিক যাতনানুভূতি শক্তি। (৬) অঙ্গ সঞ্চালনে সুখানুভূতি শক্তি।

দর্শনেন্দ্রিয়ের শক্তি ছয় প্রকার। যথা :—

(১) দূরস্থ বস্তুর অনুভূতি শক্তি, (২) চক্ষুর নিমীলনোন্মীলনী গতির অনুভূতি শক্তি, (৩) তেজঃ বা অন্ধকার অনুভূতি শক্তি, (৪) পদার্থের প্রতি স্নেহ, প্রেম এবং কুদৃষ্টিতে দর্শন করিবার শক্তি, (৫) অন্তরে বা বাহ্যে সূক্ষ্ম পদার্থের ভেদজ্ঞান শক্তি, অদ্ভূত বা যাতনা পূর্ণ পদার্থ দর্শনে বিস্ময় এবং দুঃখ অনুভূতি শক্তি।

রসনেন্দ্রিয়ের শক্তি ছয় প্রকার, যথা :—

(১) ভাল মন্দ স্বাদের ভেদ জ্ঞান, (২) যেরূপ স্বাদে বমন হয় তাহার উত্তেজনা জ্ঞান, (৩) স্বাদ হীনতার জ্ঞান, (৪) ভক্ষ্য-দ্রব্যের সুস্বাদুতা জ্ঞান, (৫) যে সুস্বাদ গ্রহণে মাদকতা জন্মে সেই স্বাদের জ্ঞান, (৬) শীত এবং উষ্ণের ভেদজ্ঞান।

ঘ্রাণেন্দ্রিয়ের শক্তি ছয় প্রকার যথা :—

(১) উত্তম বা অধম গন্ধের ভেদজ্ঞান, (২) শ্বাস প্রশ্বাসের অনুভব, (৩) উত্তম ও অধম গন্ধের ভেদ-জ্ঞানের রাহিত্য, (৪) উত্তম বা অধম গন্ধের আঘ্রাণ শক্তি, (৫) যে সৌরভ গ্রহণে

মাদকতা জন্মে তাহার জ্ঞান, (৬) দীর্ঘ শ্বাস পরিত্যাগ পূর্ব্বক অল্প অল্প শ্বাস গ্রহণের জ্ঞান। কল্পনা ও হৃদয়ের ভাবের অধিষ্ঠাত্রী এই স্থানে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হইয়াছেন। অতিশয় ইন্দ্রিয়-সুখের ভোগ হইতে আত্মাকে রক্ষা করাই ইহার কার্য্য, এবং পূর্ব্বের ন্যায় ইনিও আমার ইচ্ছা ও নিয়ম পালন করেন।

(১২) আমার দ্বাদশ সর্গ লিঙ্গমূলে অবস্থিত। এই স্থানে আত্মতত্ত্ব হইতে আমার দ্বাদশ বৃত্তি, প্রতিভা বা অবতার স্বরূপ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। ইহাকে প্রকৃতি বা তন্মাত্র বা তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা বলে। তত্ত্ব বা তন্মাত্র দুই প্রকার,—ভৌতিক-তত্ত্ব ও জ্ঞানেন্দ্রিয়-তত্ত্ব। ভৌতিক-তত্ত্ব পঞ্চ প্রকার যথা:—ক্ষিতি-তত্ত্ব, জলতত্ত্ব, অগ্নিতত্ত্ব, বায়ুতত্ত্ব এবং আকাশতত্ত্ব।

অস্থি, নখ, মাংস, মেদ, ত্বক্, শিরা, লোমকূপ, লোম প্রভৃতি যদ্দ্বারা শরীরের অবয়ব জন্মে সেই সকল দ্রব্য ক্ষিতিতত্ত্ব হইতে সম্ভূত।

লালা, দুগ্ধ, অশ্রু, নাসাস্রাব, মূত্র, স্বেদ, এবং সকল প্রকার জলীয় ধাতু, মস্তিষ্ক, পেশী, রক্ত, শুক্র ইত্যাদি জলতত্ত্ব হইতে জন্মে।

যাতনা, পীড়া, চিন্তা, অতিশয় মনের আসক্তি, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, অলস, অজীর্ণ, স্ত্রী-সহবাস, আকাঙ্ক্ষা, বিরতি, ভক্তি, একাগ্রতা, জড়তা ও শারীরিক যাতনা, এই সকল অগ্নিতত্ত্ব হইতে জন্মে।

গতিশক্তি মাত্রই বায়ুতত্ত্ব হইতে উৎপন্ন। শয়ন, প্রসারণ, ভ্রমণ, উপবেশন, ধাবন, লম্ফন, উল্লম্ফন ও কম্পন, প্রাণবায়ুর কার্য্য। শরীরে শোণিত এবং অন্য পদার্থ সঞ্চালিত করা

ব্যান বায়ুর কার্য্য। বমনের বেগ প্রভৃতি নাগ বায়ু হইতে জন্মে। পুরীষ, মূত্র, শুক্র বা গর্ভ-নিঃসরণ হওয়া অপান বায়ুর ক্রিয়া। নেত্রের নিমীলন, উন্মীলন বা পরিবর্ত্তিত করণ, কূর্ম্ম-বায়ুর ক্রিয়া। কাশি, হাঁচি, বাক্য কথন এবং স্ফীত হওন, উদান বায়ুর কার্য্য। হাঁচি বিশেষতঃ ধনঞ্জয় বায়ুর কার্য্য। হাস্য, চর্ব্বণ, মুখের প্রসারণ ও সঙ্কোচন, দেবদত্ত বায়ুর কার্য্য। দীর্ঘশ্বাস কৃকর বায়ুর কার্য্য। অগ্নি সহকারে আহারীয় দ্রব্য পরিপাক করা সমান বায়ুর ক্রিয়া।

আত্মপ্রেম, চিত্তের ভাব, আত্মরক্ষা, ভয়, লজ্জা, বিরতি, আনন্দ এবং চিন্তা এইগুলি আকাশ তত্ত্ব হইতে জন্মে। স্থূল আকাশ, চেতন-বৃত্তি-পরিচালনের অবকাশ স্বরূপ, এবং শারীরিক স্বাস্থ্যের উপযোগী।

অস্থি, মাংস, নখ, লোম প্রভৃতি শরীরের কঠিন ভাগ, পার্থিব অংশ-সম্ভূত। মূত্র, স্বেদ, শোণিত প্রভৃতি জলীয় ভাগ, জলীয়াংশ-সম্ভূত। ক্ষুধা, নিদ্রা, শ্রান্তি প্রভৃতি আগ্নেয়-অংশ-সম্ভুত। আকুঞ্চন, প্রসারণ প্রভৃতি ক্রিয়া-প্রবৃত্তি বায়ব্য অংশ-সম্ভূত। এবং ক্রোধ, ভয়, লজ্জা, প্রেম প্রভৃতি আকাশাংশ-সম্ভূত। এই স্থানে জীব এই সকল তত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া স্বীয় বৃত্তি সকল সাম্যভাবে পরিচালনা করে, এবং পাপ-কর্ম্মের আতিশয্য হইতে নিবৃত্ত হয়।

জ্ঞানেন্দ্রিয়ের তন্মাত্র সকলও পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত। যথা :—

(১) পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় তত্ত্বের সহিত মিলিত পার্থিবতত্ত্ব হইতে অহঙ্কার, প্রাণ, শ্বাস-প্রশ্বাস বায়ু, পদার্থের গন্ধ, এবং পেশীর গতি, এই পাঁচটি জন্মে।

(২) মস্তিষ্ক-গত স্মৃতি-শক্তি, অপান বায়ু নিঃসরণ-শক্তি, জিহ্বা-পেশী সঞ্চালিনী-শক্তি, চর্ব্বণ ও লেহন-শক্তি, শুক্র নিঃসারণ দ্বারা সন্তান-জননী-শক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়-তত্ত্বের সহিত জল-তত্ত্ব মিলিত হইয়া এই পঞ্চবিধ শক্তি জন্মায়।

(৩) ভৌতিক বুদ্ধিবৃত্তি, স্বর-উৎপাদিকা-শক্তি, ভৌতিক-দৃষ্টি, দৃশ্য বস্তুর আকার অনুভব, এবং দৈহিক সুখ দুঃখ ভোগের অনুভব, অগ্নিতত্ত্বে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়-তত্ত্ব মিলিত হইয়া এই পাঁচটি গুণ জন্মায়।

(৪) মস্তিষ্ক-গত চিত্তবৃত্তি বা চিন্তাশক্তি, সর্ব্বদেহ সঞ্চারিণী বায়বী-শক্তি, (যাহা দ্বারা শোণিত চালিত হয়) পাকাশয় আশ্রিত সমান বায়ু, শীতোষ্ণ অনুভব শক্তি, সহসা চমকিত হওনের শক্তি এবং মস্তক সঞ্চালনী-শক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয় তত্ত্বের সহিত বায়ব্য-তত্ত্ব মিলিত হইলে এই পঞ্চ শক্তি জন্মে।

(৫) ভৌতিক-তত্ত্ব এবং জ্ঞানেন্দ্রিয়ে অধিষ্ঠিত আকাশ, যে সকল শিরার মধ্যে শোণিত ও অন্যান্য ধাতু প্রবাহিত হয়, সেই সকল শিরার অভ্যন্তরে অধিষ্ঠিত আকাশ, বাহিরে এবং অন্তরের শব্দে অধিষ্ঠিত আকাশ, উচ্চারিত বর্ণে অধিষ্ঠিত আকাশ, এবং সঙ্গীতের সুরে অধিষ্ঠিত আকাশ। জ্ঞানেন্দ্রিয় তত্ত্বের সহিত মিলিত হইয়া আকাশ পূর্ব্বোক্ত পঞ্চ প্রকারে বিভক্ত হয়। যাহাতে জীব সকল পাপে নিমগ্ন হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, সেই সকল কার্য্য হইতে বিরত করিয়া জীবকে রক্ষা করাই এই জ্ঞানেন্দ্রিয় তত্ত্বে ও ভৌতিক তত্ত্বে অধিষ্ঠিত আত্মার কার্য্য।

হে জীবাত্মন্! আমি কিরূপে দুই প্রকার ভাবে প্রকাশিত হই, তাহা তোমার নিকট কীর্ত্তন করিলাম, অর্থাৎ (১) নিষ্ক্রিয়

ভাব বা নিবৃত্তি অবস্থা (২) সক্রিয় ভাব বা প্রবৃত্তি অবস্থা, যাহা কেবল মনের কল্পনা মাত্র।

আমার অনন্ত আত্মা ব্রহ্মস্বরূপ নিষ্ক্রিয় ভাব হইতে প্রথমতঃ স্বয়ং প্রকাশ জ্ঞানময় বা বোধময় ভাবের অধিষ্ঠাতা চিৎ। (চিত্র সংখ্যা ৭)

দ্বিতীয়তঃ ; বুদ্ধি-তত্ত্ব-প্রতিবিম্বিত ঘনীভূত চিৎ (অর্থাৎ অখণ্ড অনন্ত চেতন, অজ্ঞান বা মায়া সহকারে সঙ্কুচিত হইয়া অপরিস্ফুট অহং ভাবে বুদ্ধিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত হয়। (চিত্র সংখ্যা ৮)

তৃতীয়তঃ। সেই অপরিস্ফুট অহং ভাবে সঙ্কুচিত চেতন পরিস্ফুট অহং জ্ঞানে প্রতিবিম্বিত। (চিং সং ৯)।

চতুর্থতঃ। সেই অহং জ্ঞানবিশিষ্ট চেতন প্রজ্ঞাতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত। পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের দ্বারা যে সংস্কার জন্মে, সেই সংস্কার স্বরূপ চেতন বৃত্তিকে প্রজ্ঞা বলে। (চিং সং ১০)

পঞ্চম। প্রজ্ঞাতত্ত্ব প্রতিবিম্বিত চেতন স্মৃতিতত্ত্বে আবির্ভূত। (চিঃ সং ১১)

ষষ্ঠ। স্মৃতিতত্ত্বে প্রতিবিম্বিত চেতন চিত্ত তত্ত্বে বা চিন্তাবৃত্তিতে আবির্ভূত। (চিং সং ১২)

সপ্তম। চিত্ত-তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত চেতন বাসনা তত্ত্বে আবির্ভূত (চিং সং ১৩)

অষ্টম। বাসনা তত্ত্বে প্রতিবিম্বিত চেতন উত্তমাধম ভেদ বিবেচনার বৃত্তিতে আবির্ভূত। (চিং সং ১৪)

নবম। উত্তমাধম-ভেদ বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চেতন বিচার বৃত্তিতে আবির্ভূত। (চিং সং ১৫)

দশম। বিচার বৃত্তিতে প্রতিবিম্বিত চেতন চিত্ত ভাবের বৃত্তিতে আবির্ভূত। (চিং সং ১৬)

একাদশ। চিত্তভাবে প্রতিবিম্বিত চেতন জ্ঞানেন্দ্রিয় বৃত্তিতে আবির্ভূত। (চিং সং ১৭)

দ্বাদশ। জ্ঞানেন্দ্রিয়ে প্রতিবিম্বিত চেতন ভৌতিক ও প্রাকৃতিক তত্ত্বে আবির্ভূত।

অতএব হে জীবাত্মন্! তুমি মানব আকারে আমার এই দ্বাদশ প্রতিভা-বিশিষ্ট বৃত্তির সমষ্টি জীব আমা হইতে ভিন্ন ;

তত্ত্বলয় কৈবল্য অনুভূতির অভ্যাস করণার্থ পরমাত্মা জীবাত্মাকে উপদেশ করিতেছেন।

হে জীব! তোমার অস্তিত্ব ভ্রান্তিময়, এইটি তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমার দ্বিতীয় অবস্থা বা প্রবৃত্তি-ভাবের দ্বাদশ বৃত্তি তোমাকে কহিয়াছি। এক্ষণে তোমার অস্তিত্বই নাই, এইটি তোমাকে বুঝাইবার জন্য আমার দ্বিতীয় অবস্থা বা প্রবৃত্তি ভাবেরই অস্তিত্ব নাই, ইহাই দেখাইব।

পরমাত্মার নিকট শ্রবণ করিয়া শিষ্য জীবাত্মা বুঝিতে পারিলেন যে যাবৎ তিনি (জীব) আত্মা হইতে আপনাকে ভিন্ন ভাবিয়া চিন্তা করেন তাবৎ কালই তিনি (জীব) প্রকাশ পাইতে থাকেন, পরমাত্ম চিন্তায় তাঁহার (জীবের) অস্তিত্ব এককালেই থাকে না।

হে পুণ্যাত্মন্ গুরু স্বামিন্! আপনার বাক্য শুনিয়া আমি প্রত্যক্ষ পরিষ্কাররূপে বুঝিলাম যে যাবৎ অমি আপনার দ্বিতীয় তত্ত্ব বা প্রবৃত্তি অবস্থা প্রকৃত বলিয়া চিন্তা করি তাবৎ কাল মাত্র আমি আপন অস্তিত্ব স্বপ্নের ন্যায় প্রত্যক্ষ করি। এক্ষণে হে পুণ্যাত্মন্! আমি বিনীত ভাবে প্রার্থনা করিতেছি, যে বিনষ্ট করিয়াই হউক, বা বিস্মরণ হইয়াই হউক, যাহাতে আমি আপনি পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ-বৃত্তি বর্জ্জিত হইতে পারি, তাহার কৌশল আমাকে উপদেশ করুন্।

তাহাতে পরমাত্মা গুরু তাহাকে আপন প্রথম তত্ত্ব বা নিবৃত্তি-অবস্থার প্রকৃত ভাবের উপদেশ এইরূপে প্রদান করিতে লাগিলেন। আমি অনন্ত আত্মা নিষ্ক্রিয় অবস্থায় তিন ভাবে প্রকাশ পাই। যথা :—

১। নিত্য, অনন্ত, সর্ব্বসাক্ষী আনন্দ স্বরূপ।

২। অনুগ্রহ এবং করুণার নির্ম্মল পবিত্র তত্ত্বের স্বরূপ।

৩। বিচার এবং ক্রোধের কঠিন ও অবিচলিত তত্ত্বের স্বরূপ।

আমার তৃতীয় তত্ত্বের দ্বারা বিমার্গগামী জীবগণকে কর্ম্ম-ফল প্রদান করি। দ্বিতীয় তত্ত্বের দ্বারা তাহাদিগের কল্যাণ বিধান করি, এবং আমাকে প্রত্যক্ষ করিতে সমর্থ করি। প্রথম তত্ত্বের দ্বারা তাহাদিগকে আমার অনন্ত আত্ম স্বরূপে পরিণত হইতে সমর্থ করি।

জীবগণ দেহান্তরে কর্ম্মফলভোগ করিয়া কি রূপে আত্মশুদ্ধি ও মুক্তির জন্য অনুতাপ করে তাহা এক্ষণে কহি-তেছি। এইটি বুঝিবার জন্য অন্য জীবগণ কিরূপে কর্ম্মফল

ভোগ করে তাহা তুমি স্বয়ং প্রত্যক্ষ কর। তাহা হইলে তুমি আমার অনন্ত মহিমা, অনুগ্রহ, করুণা এবং ক্রোধ স্পষ্টই অনুভব করিতে পারিবে। তুমি তোমার পূর্ব্বোক্ত দ্বাদশ বৃত্তিকে উপদেশ দাও যে তাহারা আপনাদিগের জ্ঞানদৃষ্টি প্রসারিত করিয়া আমাকে প্রত্যক্ষ করে। তাহা হইলে তাহারা আমাকে ধারণা করিতে ও আমাতেই লীন হইতে সমর্থ হইবে। ইহলোকে নিত্য ও অনিত্য বস্তুর প্রভেদ জানিবার জন্য তাহাদিগকে উপদেশ দিয়া কহিবে যে—

১। এই সংসারের সমস্ত সুখই তোমাদিগের ন্যায় মিথ্যা ও অসার। কিন্তু তোমাদিগের অভ্যন্তরস্থ চেতনময় আত্মাই অক্ষয়, অবিনাশী সৎপদার্থ। এই নিত্য এবং অনিত্য বস্তুর ভেদ-জ্ঞানকে নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক অথবা অসদ্বস্তু হইতে মনের নিবৃত্তি বা ত্যাগ বলা যায়।

২। এই জ্ঞান প্রাপ্ত হইলে তুমি ইহলোকে ও পরলোকে সুখ সম্ভোগের বাসনা পরিত্যাগ করিবে। ইহাকে ইহামুত্র ফল-ভোগ বিরাগ অথবা ইহ পরলোকের আসক্তি ত্যাগ বলা যায়।

৩। তুমি এরূপ নিশ্চলভাবে মগ্ন হইবে যেন ঐহিকের সুখ তোমাকে বিচলিত করিতে না পারে। ইহাকে শম এবং দম কহে।

৪। এই সংসার সুখ একেবারে পরিত্যাগ করিবে আর তাহার অনুসরণ করিবে না। ইহাকে উপরতি বলে।

৫। সুখ দুঃখ, শীত, উষ্ণ, আসক্তি ঘৃণা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা প্রভৃতি দ্বন্দ্ব বিষয়ে উদাসীন ভাব অবলম্বন করিবে। ইহাকে তিতিক্ষা বলে।

৬। অনন্ত আত্মতত্ত্বের মহিমা চিন্তায় নিরন্তর প্রগাঢ় ভাবে নিমগ্ন থাকিবে। ইহাকে সমাধান বলে।

৭। এই নিত্য আনন্দ ভাবে নিরন্তর অবস্থিতি করিতে চেষ্টা করিবে। হে জীবাত্মন্, তুমি এক্ষণে তোমার দ্বাদশ বৃত্তিকে স্ব স্ব কার্য্য ইহাতে নিবর্ত্তিত করিয়া কুণ্ডলীতে (চিং সং ২৯) অবরোহণ করিবে, এবং সেই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে জিজ্ঞাসা করিবে, হে দেবি! আমার এই শারীরিক সমস্ত ভৌতিক কার্য্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছ তুমি কে? ইহাতে তিনি উত্তর করিবেন,—"আমি তোমার গুরু পরমাত্ম দেবের দ্বাদশ প্রতিভা বা অবতার, সুতরাং আমি সেই পরমাত্মা।" তাহাতে তুমি প্রত্যুত্তর করিবে "তোমার এইটি অতি অযথা বাক্য, যদিও তুমি গুরুদেব হইতে পরম্পরাক্রমে আবির্ভূত হইয়াছ, কিন্তু তাঁহার দ্বিতীয় অবস্থা প্রবৃত্তি তত্ত্ব হইতে সমুদ্ভূত হইয়াছ, তাঁহার প্রথম বা স্বরূপ অবস্থা নিবৃত্তি তত্ত্বের কিছুমাত্র তোমাতে নাই। তুমি তোমার প্রকৃতিগত সমস্ত কার্য্যের ফলভোগ করিয়া থাক, কিন্তু আমার গুরু দেবের কর্ম্মও নাই ভোগও নাই, কেবল তোমার সমস্ত কর্ম্মের সম্পূর্ণ সাক্ষীস্বরূপে অবস্থিত। তুমি স্বীয় যত্নের দ্বারা আপনার প্রকৃতি বুঝিতে পার না, কারণ তুমি জড়ময়, জীবহীন, এবং অনিত্য। আমার গুরুদেবের নামও নাই আকারও নাই। আমি কাশ্যপ গোত্রীয় ব্রাহ্মণ, গায়ক বা গ্রন্থ-প্রণেতা প্রভৃতি গর্ব্বিত ভাবও তাঁহার নাই। তাঁহার বৃত্তি-জাত বা স্বভাব-জাত কোন নাম নাই। নর, নারী পশু, পক্ষী, জলচর প্রভৃতি কোন প্রকার আখ্যা তাঁহার নাই, সেই সকল আখ্যা

তোমারই। পিতা, মাতা, স্ত্রী, স্বামী প্রভৃতি সম্বন্ধ সূচক নামও তাঁহার নাই, পাদ, মস্তক প্রভৃতি অবয়বও তিনি নহেন। তিনি এই সকল পদার্থ বা নাম কিছুই নহেন।" এই সকল তর্কের দ্বারা প্রকৃতি দেবি নিরুত্তর হইলে, তাঁহাকে ভৎসনা পূর্ব্বক এই আদেশ করিবে যেন এইরূপ কল্পিত বাক্য লইয়া আর তোমার সমক্ষে উপস্থিত না হন। পরে অনন্ত আত্মাতে বিলীন হও বলিয়া তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবে।

২। প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রীকে এইরূপে পরাভূত করিয়া তুমি নাভিমধ্যে আরোহণ করিবে, এবং তত্রস্থ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাকে (চিং সং ২০) পূর্ব্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিবে "তুমি কে ?" "তাহাতে তিনি উত্তর করিবেন," "আমি অনন্ত আত্মার একাদশ অবতার, সুতরাং আমি সেই অনন্তাত্মা।" তুমি তাহাতে প্রতিবাদ করিয়া কহিবে, তোমার এইটি অযথা উক্তি। কারণ (১) যখন তুমি তাঁহাতে লীন হও তখন আর তোমার অস্তিত্ব থাকে না। (২) তুমি অদৃশ্য হও কিন্তু তিনি কখন অদৃশ্য হন না। (৩) তুমি নিরন্তর সাংসারিক লাভ ও সুখের স্বপ্ন দর্শন কর, কিন্তু গুরুদেব তাহা কিছুই করেন না। (৪) তুমি কর্ম্ম নিবন্ধন সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাক, তাঁহার কোন ভোগই নাই। তাঁহার আধ্যাত্মিক শক্তিদ্বারা তুমি সঞ্চালিত হও, কিন্তু তাঁহার কোন সাহায্যই প্রয়োজন করে না। (৬) তুমি আপনাকেও জান না ও তাঁহাকেও জাননা। (৭) তোমার সকল ক্রিয়া পাপাত্মক ও সমল, কিন্তু তিনি অতিশয় পবিত্র ও নির্ম্মল। এই সকল কারণে স্পষ্টতই প্রতিপন্ন হইতেছে যে তুমি অনন্ত আত্মা নহ, পরম্পরায়

ক্রমে তাঁহার দূর-সংঘটিত প্রতিভা মাত্র।" এইরূপে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভৎ´সনা ও আশীর্ব্বিধান করিবে।

(৩) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাকে পরাভূত করিয়া হৃদয় মধ্যে আরোহণ করিবে। (চিং সং ২১) তথায় ভাব ও কল্পনা বৃত্তির অধিষ্ঠাতার সহিত পূর্ব্বের ন্যায় প্রশ্নোত্তর সমাপন হইলে এই বলিয়া তাঁহাকে পরাভূত করিবে। (১) "গুরুদেব অনন্তাত্মা তোমাকে সম্পূর্ণ-জানেন, কিন্তু তুমি তাঁহাকে জান না। (২) তিনি নিরন্তর সাক্ষিস্বরূপে অবস্থিত হইয়াও সাক্ষিত্ব ব্যাপারে কখন পরিশ্রান্ত নহেন, কিন্তু তুমি তোমার কর্ত্তব্য সম্পাদনে শীঘ্র ক্লান্ত হইয়া থাক এবং দেহান্তরে সুখ দুঃখ ভোগের কালে এককালে বিরত হইয়া থাক। (৩) তিনি নির্ব্বিকল্প, কিন্তু তুমি ক্ষণকালের জন্যও এক ভাবে স্থির থাকিতে পার না। (৪) তিনি জানেন যে তোমরা সকলেই তাঁহা হইতে সমুদ্ভূত, কিন্তু তোমরা আপনাদিগের জন্ম-বৃত্তান্ত কিছুই জাননা। (৫) তিনি তোমাদিগের প্রত্যেককে জানেন, কিন্তু তোমরা পরস্পরকে জাননা। (৬) তোমার প্রকৃতি উগ্র এবং উত্তেজনশীল, কিন্তু তিনি প্রশান্ত নির্ম্মল এবং নিশ্চল। অতএব তুমি অনন্ত আত্মা হইতে পার না, কেবল তাঁহার ছায়া বা প্রতিবিম্ব মাত্র।" ভাব বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে এইরূপে পরাভূত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভৎ´সনা ও আশী-র্ব্বিধান করিবে।

৪। ভাববৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে পরাভূত করিয়া কণ্ঠদেশে আরোহণ করিবে। তথায় ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিবৃত্তিকে (চিত্র সং ২২) এইরূপে পরাভূত করিবে; যথা;—" তুমি অনন্ত

আত্মা নহ, কারণ (১) তুমি লঘুচিত্ত ও বিকার বিশিষ্ট। (২) তুমি সংশয় উত্থিত করিয়া চিত্তকে ঘোরতর পাপকার্য্যে নিয়োজিত কর। (৩) তোমার ক্রিয়া সম্পাদিকা বুদ্ধি, (সত্ত্ব-রজো বা তমোগুণের বশে পাপ প্রবৃত্তি জন্মিলে সেই বুদ্ধি সেই-রূপ কার্য্য সম্পাদনের কৌশল উদ্ভাবন করিতে প্রবৃত্ত হয়) অন্ধ, বধির এবং প্রতারক এবং ধ্বংসের কারণ। (৪) স্বার্থপর, কটুভাষী, বিনতি-হীন এবং নিষ্ঠুর-স্বভাব জনিতই তোমাকে পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ করিতে হয়। অতএব তুমি অনন্তাত্মা নহ।" এইরূপে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভৎসনা ও আশীর্ব্বিধান করিবে।

৫। এইরূপে ব্যবসায়াত্মিকা বা ক্রিয়া-সম্পাদিকা বুদ্ধি-বৃত্তিকে নিবৃত্ত করিয়া জিহ্বামধ্যে আরোহণ কর (চিং সং ২৩)। তথায় ত্রিগুণাত্মিকা উত্তমাধম বিবেচনা বৃত্তিকে (চিং সং ২৩) এইরূপে পরাভূত করিবে যথা; "তুমি গুরুদেব অনন্তাত্মা নহ, কারণ, (১) তুমি তমোগুণজনিত সৃষ্টি পালন সংহার মঙ্গল বিধান, এবং সংহনন কার্য্যে প্রকৃতি কর্ত্তৃক নিয়োজিত। (২) ভাববৃত্তির দ্বারা ভ্রান্তি-পূর্ণ অযথা বিচারে অপচালিত হও। সত্ত্বগুণের বশে তুমি অন্তঃকরণের উত্তমাধম কার্য্য নির্দ্দেশ করিয়া থাক। এইরূপে তুমি ত্রিবিধ বৃত্তির দ্বারা ত্রিবিধ কর্য্য সম্পন্ন কর, কিন্তু আমার গুরুদেবের কোন কার্য্য নাই|এবং তোমার|কার্য্যের ভোক্তাও নহেন, কেবল মাত্র সাক্ষি স্বরূপ। অতএব তুমি অনন্তাত্মা নহ।" এইরূপে তাঁহাকে নিরস্ত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভৎসনা ও আশীর্ব্বিধান করিবে।

৬। এইরূপে উত্তমাধম বিবেচনা বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে

পরাভূত করিয়া নাসাগ্রে উপনীত হইবে। তথায় আশা বা ভোগ-কল্পনা বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে এইরূপে নিরস্ত করিবে (চিং সং ২৪) যথা—"তুমি, গুরুদেব অনন্তাত্মা নহ। কারণ (১) তুমি আত্মাভিমান, অহঙ্কার ও গর্ব্বিত ভাব পরিপূর্ণ, (২) তুমি আত্মসুখে ও জগতের প্রমোদ ব্যাপারে নিমগ্ন, (৩) আত্ম বঞ্চনার কল্পনা সমূহে পরিপূর্ণ, সেই জন্যই অনিত্য ভ্রান্তিময় সাংসারিক সুখে, নিত্য ও সত্য বলিয়া তোমার বিশ্বাস জন্মিতেছে। ইহাতে স্পষ্টই প্রতীতি হইতেছে যে তুমি গুরুদেব অনন্তাত্মা নহ।" এইরূপে তাঁহাকে পরাভূত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভৎর্সনা ও আশীর্ব্বিধান করিবে।

৭। আশা-বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে পরাভূত করিয়া ভ্রূমধ্যে চিত্ত-বৃত্তির অধিষ্ঠাতার (চিং সং ২৫) নিকট গমন পূর্ব্বক তাঁহাকে এইরূপে পরাভূত করিবে। "তুমি, গুরুদেব অনন্তাত্মা নহ। কারণ (১) তুমি অন্তরে ভ্রান্তিময় অনিত্য কল্পনা সমূহ উদ্ভাবিত কর। (২) তুমি নূতন নূতন চিত্তহারী ভাব সমূহ সৃষ্টি করিয়া আমাকে একাগ্র ভাব হইতে বিচলিত কর। (৩) তুমি কল্পনা চিত্রকরীর সহকারে প্রকাণ্ড চিত্ত-বিনোদন বিলাস-ভবন রচনা কর যাহা পরিণামে ধূমে বিলীন হইয়া নিরাশে পর্য্যবসিত হয়। তোমার কিরূপে গুরুদেব হওয়া সম্ভবে। তাঁহার এ সকল কোন গুণই নাই।" এইরূপে তাহাকে নিরস্ত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভৎর্সনা ও আশীর্ব্বিধান করিবে।

৮। এইরূপে জয়লাভ করিয়া ললাট মধ্যে আরোহণ করিবে এবং স্মৃতির অধিষ্ঠাতার (চিং সং ২৬) নিকট উপনীত

হইয়া তাহাকে এইরূপে নিরস্ত করিবে; "তুমি গুরুদেব অনন্তাত্মা নহ। কারণ (১) তুমি দুর্নীতিগর্ভ বা সুনীতিগর্ভ গাথা সমস্ত আপন স্মৃতিগর্ভে ধারণ কর; (২) তুমি কে? ঈশ্বর কি? ব্রহ্মাণ্ড কি? এই সকলের প্রকৃত তত্ত্ব তুমি সহজেই বিস্মৃত হও, কিন্তু আমি বা আমার গুরুদেব কখন আমাদিগের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইনা, অতএব তুমি অনন্ত আত্মা নহ।" তাহাকে এইরূপে নিরস্ত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভৎ‍ঁসনা এবং আশীর্ব্বিধান করিবে।

৯। স্মৃতির অধিষ্ঠাতাকে পরাভূত করিয়া ললাটের ঊর্দ্ধভাগে মস্তিষ্কের তলদেশে উপনীত হইবে। তথায় প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাতাকে (চিং সং ২৭) এই প্রকারে পরাভূত করিবে— "তুমি অনন্তাত্মা নহ, কারণ—(১) তুমি এই সংসারের অনিত্য সুখে আসক্ত, (২) তুমি যে সুখের স্বাদ একবার গ্রহণ কর, তাহাতে তোমার তৎক্ষণাৎ বিরতি উপস্থিত হয়। আমার গুরুদেবের এ সকল বৃত্তি নাই। অতএব তুমি, গুরু পরমাত্মদেব নহ।" তাহাকে এইরূপে নিরস্ত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভৎ‍ঁসনা ও আশীর্ব্বিধান করিবে।

১০। এক্ষণে হে জীবাত্মন্, মস্তিষ্কের মধ্যস্থানে উপনীত হইয়া তথায় জ্ঞানের অধিষ্ঠাতাকে (চিং সং ২৮) এই রূপে নিরস্ত করিবে যথা—"তুমি গুরু পরমাত্মদেব নহ, কারণ (১) তোমার জ্ঞান ভ্রান্তিময় এবং বৈষম্যপূর্ণ, (২) তাহা অস্থির ও পরিবর্ত্তনশীল, অতএব তুমি গুরু পরমাত্মা নহ, কেবল তাঁহার ছায়া মাত্র।" এইরূপে তাহাকে নিরস্ত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভৎ‍ঁসনা ও আশীর্ব্বিধান করিবে।

১১। এইরূপে জয়লাভ করিয়া মস্তিষ্কের উপরিভাগে আরোহণ করিবে, তথায় বুদ্ধিতত্ত্বের (চিং সং ২৯) অধিষ্ঠাতাকে এইরূপে নিরস্ত করিবে।" তুমি অনন্তাত্মা গুরুদেব নহ। কারণ তুমি সংশয় পূর্ণ এবং পরমাত্মার সহিত তোমার যে সাম্যভাব, তাহাতে তোমার বিশ্বাস নাই। ভ্রান্তির আবরণে আবৃত থাকা প্রযুক্ত তুমি পরমাত্মদেবের পবিত্র জ্যোতিঃ দর্শনে সমর্থ নহ, এবং যিনি তোমার সংশয় দূর করিতে সমর্থ, সেই পরমাত্ম দেবকে তোমার প্রত্যক্ষ করিবারও সামর্থ নাই। অতএব তুমি অনন্তাত্মা নহ।" এইরূপে তাহাকে জ্ঞানদান ও পরাভূত করিয়া পূর্ব্বের ন্যায় ভৎসনা ও আশীর্ব্বিধান করিবে।

১২। জ্ঞানময় তত্ত্বের অধিষ্ঠাতা হে জীবাত্মন্! এক্ষণে তুমি শিরঃ কপালের মধ্যস্থানে আরোহণ করিয়া (চিং সং ৩০) আপনা আপনি এই রূপে প্রশ্ন করিবে যথা—"অনন্ত আত্মদেবের সহিত যাহার অল্প মাত্র ভেদ, সেই আমি কে? ভ্রান্তি জ্ঞানের দ্বারা আমি যে একাদশ বৃত্তি সৃষ্টি করিয়াছিলাম তাহা এক্ষণে নিরস্ত করিয়াছি, এক্ষণে অনন্ত আত্মার সহিত আমার যে অল্প ভেদ আছে তাহাও আর থাকা উচিত নহে।" এই সঙ্কল্প করিয়া জীবাত্মা অনন্ত আত্মতত্ত্বে মগ্ন হইয়া এইরূপে তাহাকে কহিতে লাগিলেন—"হে পবিত্র গুরুস্বামি! আপনার অনুগ্রহে ও আনুকূল্যে আমি এক্ষণে একাদশ বৃত্তিকে এরূপে পরাভূত করিয়াছি যে আমাকে বিচলিত করিবার জন্য আর তাহারা আমার সমক্ষে উপস্থিত হইবে না। এক্ষণে আমি বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে আমি যেরূপে আপনার

বিনীতভাবে এই প্রার্থনা করিতেছি যে আমি যেরূপে আপনার স্বারূপ্য প্রাপ্ত হই তাহার উপদেশ প্রদান করুন্।" তাহাতে পরমাত্মা কহিলেন "তোমার সকল মলিনতা এখনও দূর হয় নাই, অতএব তুমি পরমাত্ম-স্বরূপ প্রাপ্ত হইতে পার না। এক্ষণে আমি তোমাকে যোগসমাধির অভ্যাস উপদেশ করিতেছি, তদ্দ্বারা তোমার অবশিষ্ট সমস্ত পাপ দূরীভূত হইলে সমাবস্থা প্রাপ্ত হইবে।"

পরমাত্মা জীবাত্মাকে বৈদান্তিক রাজযোগ উপদেশ করিতেছেন।

তখন পরমাত্মা কহিলেন, হে জীবাত্মন্, তুমি পুনর্ব্বার কুণ্ডলীতে অবরোহণ কর, এবং প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রীকে লইয়া তাহার সমস্ত শক্তি মোচন করিয়া এই বলিয়া আশীর্ব্বিধান করিবে, "হে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী! নির্ম্মলীভূতা হইয়া পবিত্রাত্মা হও।" পরে ইহাকে ইড়া পিঙ্গলা ও সুষুম্না (চিং সং ১।২।৩) নাড়ীর অভ্যন্তর দিয়া উর্দ্ধে আনয়ন করিবে। তৎকালে জ্ঞানাকাশে "ওঁ নমঃ শিবায়ঃ" এই মন্ত্র উচ্চারিত হইতে থাকিবে। ইহাই ভূত শুদ্ধি বা দৈহিক যন্ত্র হইতে নির্ম্মলীকরণার্থ দৈবী পবিত্র মন্ত্র। এইরূপে প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রীকে নাভিমণ্ডলে আনিয়া জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাতে লয় কর। প্রকৃতির অধিষ্ঠাতার সত্তা আর রহিল না। তোমার প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা-রূপ অস্তিত্ব ও তাহার শক্তি, জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতায় লীন হইয়াছে। সেই স্থানে চেতন-বৃত্তির দ্বারা অনন্তাত্মা ভাবে আপনাকে ক্ষণকাল চিন্তা করিবে।

তোমার জ্ঞানাকাশের দ্বারা সহসা শান্তিমণ্ডল হইতে কুণ্ডলীকে বিচ্ছিন্ন করিয়া পূর্ব্বোক্ত তিন নাড়ির মধ্য দিয়া হৃদয় মধ্যে উন্নীত করিবে। তথায় জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতাতে লীন হইবে। উত্তোলন কালে এই মন্ত্র পূর্ব্ববৎ পাঠ করিতে থাকিবে, " ওঁ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র, মহেশ্বরী ভূয়ো নমঃ।" এইটি ইন্দ্রিয় শুদ্ধির মন্ত্র। সেই স্থানে জীবচৈতন্য-মধ্যে অনন্ত আত্মাকে ক্ষণকাল চিন্তা করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ভাববৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে কণ্ঠমধ্যে উত্তোলিত করিয়া ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি-বৃত্তিতে লয় করিবে। উত্তোলন কালে এই মন্ত্র জ্ঞানাকাশে পাঠ করিবে যথা—"ওঁ হা হী হু হি ওহো নমঃ।" এইটি রাগদ্বেষ শুদ্ধির মন্ত্র। সেই স্থানে পূর্ব্বোক্তরূপে ক্ষণকাল অনন্ত আত্মাকে চিন্তা করিবে। পূর্ব্বোক্ত প্রকারে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে "ওঁ হ্রীং শ্রীং ঐং ক্লিং সৌং নমঃ," এই অন্তঃকরণ শুদ্ধির মন্ত্র জ্ঞানাকাশে উচ্চারণ পূর্ব্বক জিহ্বা মধ্যে উত্তোলিত করিয়া, ত্রিগুণাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তিতে লয় করিবে। সেই স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষণকাল অনন্ত আত্মাকে চিন্তা করিবে।

সেইরূপে ত্রিগুণাত্মিকা অন্তঃকরণ বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে আশা ও কল্পনা বৃত্তির অধিষ্ঠাতাতে লয় করিবে। তৎকালে এই মন্ত্র পূর্ব্ববৎ উচ্চারণ করিবে, "হ্লং হ্বং হ্রং ঝং থং নমঃ," এইটি অন্তঃকরণ-বৃত্তি শুদ্ধি বা ত্রিগুণ-শুদ্ধির মন্ত্র। সেই স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মাকে চিন্তা করিবে।

সেই প্রকারে আশা ও কল্পনা বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে চিত্ত-বৃত্তির অধিষ্ঠাতাতে লয় করিবে। তৎকালে, "শিবায় বসি শিবায় নমঃ," এই কল্পনা-বৃত্তি শুদ্ধির ত্রিমল-শুদ্ধির মন্ত্রটি

পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চারণ করিতে থাকিবে। সেই স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় আত্মাকে চিন্তা করিবে।

চিত্তবৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে সেইরূপে স্মৃতিবৃত্তির অধিষ্ঠাতাতে লয় করিবে। তৎকালে "শিবশরণম্" এই মন্ত্রটি পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চারণ করিতে থাকিবে। এইটি চিত্ত-শুদ্ধি বা বিন্দুময়-শুদ্ধি মন্ত্র। সেই স্থানে পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষণকাল আত্মাকে চিন্তা করিবে।

স্মৃতি-তত্ত্বের অধিষ্ঠাতাকে পূর্ব্বের ন্যায় প্রজ্ঞাতত্ত্বের অধিষ্ঠাতাতে লয় করিবে। তৎকালে, "শিব শিব পূর্ত্তি," এই স্মৃতি-শুদ্ধি বা নাদময় শুদ্ধির মন্ত্র পূর্ব্ববৎ উচ্চারণ করিতে থাকিবে। পূর্ব্বের ন্যায় সেই স্থানে ক্ষণকাল আত্মচিন্তা করিবে।

প্রজ্ঞা তত্ত্বের অধিষ্ঠাতাকে লইয়া পূর্ব্বোক্ত প্রকারে জ্ঞান বৃত্তির অধিষ্ঠাতাতে লয় করিবে। তৎকালে, "শিব শিব শিবঃ নমস্তে নমস্তুঃ," এই প্রজ্ঞা-তত্ত্বশুদ্ধি অথবা কলাময় শুদ্ধির মন্ত্রটি পূর্ব্বের ন্যায় উচ্চারণ করিতে থাকিবে। সেইস্থানে পূর্ব্ববৎ ক্ষণকাল আত্মচিন্তা করিবে।

সেই প্রকারে জ্ঞান-বৃত্তির অধিষ্ঠাতাকে বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতাতে লয় করিবে, তৎকালে এই মন্ত্র পূর্ব্ববৎ উচ্চারণ করিতে থাকিবে, যথা—অহমেব ব্রহ্ম, শিব শিব শিব শিবঃ ঐক্য অর্পণ নমঃ। এইটি জ্ঞানবৃত্তি শুদ্ধি বা তৎপরময় শুদ্ধির মন্ত্র। এই স্থানেও পূর্ব্ববৎ ক্ষণকাল আত্মচিন্তা করিবে।

বুদ্ধি তত্ত্বের অধিষ্ঠাতাকে পূর্ব্ববৎ চেতনময় বিজ্ঞান তত্ত্বের অধিষ্ঠাতাতে লয় করিবে। তৎকালে এই মন্ত্র উচ্চারণ করিতে থাকিবে, যথা—শিব শিব "শিব শিব শিবঃ নমঃ নমস্তে

শিবোঽহম্।" এইটি বুদ্ধি তত্ত্ব বা পরমস্ত শুদ্ধির মন্ত্র। এই স্থানেও পূর্ব্বের ন্যায় ক্ষণকাল আত্মচিন্তা করিবে।

জীব-চৈতন্যের স্বরূপ সেই বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতাকে সহসা জ্ঞানাকাশের দ্বারা আমাতে লয় কর, এবং এই মন্ত্রের দ্বারা ইহাকে অনন্ত বিশ্বাত্মারূপে পরিণত কর। "শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিবোঽহম্; ব্রহ্মোঽহম্ জ্ঞানোঽহম্ আকাশোঽহম্ শূন্যোঽহম্ ব্যাপকোঽহম্ আনন্দোঽহম্ লয়োঽহম্ বোধোঽহম্ সাক্ষ্যহম্ শান্তোঽহম্ শুদ্ধোঽহম্ নিত্যোঽহম্ প্রণবোঽহম্ নিরাকারোঽহম্ উগ্রম্ রূপাকরম্ একম্।" এইটী লয়বোধের মন্ত্র।

প্রকৃতির অধিষ্ঠাতা বা জ্ঞানেন্দ্রিয়বৃত্তি, অন্তঃকরণবৃত্তি, ত্রিগুণাত্মিকা বিবেচনা বৃত্তি, আশা ও কল্পনা বৃত্তি, চিন্তাবৃত্তি, স্মৃতিবৃত্তি, প্রজ্ঞাবৃত্তি, জ্ঞানবৃত্তি এবং বুদ্ধিতত্ত্বের ও জীব চৈতন্যরূপ বিজ্ঞানতত্ত্বের অধিষ্ঠাতৃত্ব হইতে এক্ষণে বিমুক্ত হইয়া, তুমি আমার অনন্ত আত্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইয়াছ।

এই অবস্থা স্থিরতর রাখিবার জন্য তুমি পুনর্ব্বার সুষুম্না মার্গে প্রবেশ পূর্ব্বক ক্ষণকালের নিমিত্তও অবস্থিতি না করিয়া এককালে কুণ্ডলীতে গমন করিবে। অবরোহণ কালে জ্ঞানাকাশে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সকল কুণ্ডলীতে পাঠ করিতে থাকিবে, এবং মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরস্থ কুম্ভক নাড়ী মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক কুণ্ডলীমধ্যস্থিত পুচ্ছবিশিষ্টা ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ব্রহ্মচৈতন্যকে গ্রাস করিবার ছলে ব্রহ্মরন্ধ্রে আরোহণ করিয়া অনন্তাত্মাতে লীন হইবে। আরোহণকালে তোমার জ্ঞানাকাশে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র সকল বেগে উচ্চারিত হইতে থাকিবে, তদ্দ্বারা শীঘ্র

অনন্ত আত্মাতে লয় প্রাপ্ত হইবে। আমার অনন্ত আত্মাকে সম্পূর্ণরূপে লীন হইলে, জ্ঞানাকাশ চক্রের ন্যায় আরোহণ ও অবরোহণ করিতে থাকুক। অবরোহণে নির্ম্মলীভূত হইবে এবং আরোহণে লয় প্রাপ্ত হইবে।

হে জীবাত্মন্, এক্ষণে স্মরণ রাখিবে যে তোমার যে দ্বাদশ বৃত্তির মৃত্যু হইয়াছে, তাহাদিগের পূতিগন্ধ দ্বারা সমাধিকালে যেন তোমাকে বিচলিত হইতে না হয়। তোমাকে পুনর্ব্বার সতর্ক করিতেছি, যেন পুনরায় সেই বিশ্বাস-ঘাতক বৃত্তি সমূহের নীচ অবমানিত দাস হইও না।

যদি এই অবস্থায় অনন্ত আত্মাকে দর্শন করিতেছি এরূপ জ্ঞান জন্মে, তাহা হইলে সেই জ্ঞানকেও পরিত্যাগ করিবে। কারণ, কে দর্শন করে এবং কি বা দৃশ্য হয়। বস্তুতঃ চেতন হইতে দ্বৈতভাব নিঃশেষে পরিত্যাগ করিয়া আপনাকে শূন্য-ময় করিবে। তুমি অনন্ত আত্মার স্বরূপ হইবে, কিন্তু অনন্ত আত্মার স্বরূপ হইলাম বলিয়া তোমার জ্ঞান থাকিবে না।

পরমাত্মা জীবাত্মাকে সামাধির গূঢ় অবস্থা অথবা বৈদান্তিক রাজ-যোগ বা শিবযোগ-সিদ্ধির উপদেশ প্রদান করিতেছেন।

এই কালে তুমি অনন্ত বিশ্বব্যাপী বৃক্ষের স্বরূপে অবস্থিত হইবে। সংসারের জীবাত্মাসমূহ তাহার কাণ্ড, প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ তাহার প্রধান শাখা, জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ তাহার প্রশাখা, অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ তাহার পত্র, স্মৃতি এবং চিত্তবৃত্তি তাহার পুষ্প, জ্ঞান তাহার ফল এবং জীব-চেতন বা জীবের অভিজ্ঞান তাহার বীজ। আধ্যাত্মিক অবস্থায়, তুমি কি? তুমি কে? কোথা হইতে আসিলে? এই সকল তুমি এককালে বিস্মৃত

হইবে। তোমার দেহের বা তোমার দ্বাদশ চেতন-বৃত্তির অস্তিত্ব জ্ঞান কিছুই থাকিবে না। তুমি কেবল বিশ্বব্যাপী অনন্ত আত্মা, নিত্য ও পবিত্র, জীবগণের আন্তরিক ও বাহ্যিক ক্রিয়ার সাক্ষীরূপে অবস্থিতি করিবে। তুমি সকল দেখিবে, সকল জানিবে, তোমাকে কেহ দেখিতে বা জানিতে পারিবে না। তুমি দ্বাদশ বৃত্তি হইতে বিরত হইয়া, প্রথম অর্থাৎ শুদ্ধ চেতন-ময় অবস্থায় অবস্থিত হইলে, তোমার এইরূপ ফল-লাভ হইবে।

অতএব সাবধান হও আমার দ্বিতীয় তত্ত্বে প্রবেশ করিবে না, তাহা কেবল আমার ইচ্ছা-শক্তি ও সৃষ্টি-ক্রিয়ার নিয়ম মাত্র। তুমি যাবৎ প্রথম তত্ত্বে অবস্থিত থাকিবে, তাবৎ দেহের অভ্যন্তরে আছ, কি বাহিরে আছ, গৃহে আছ, কি গহ্বরে কি জঙ্গলে আছ, তাহা তোমার উপলব্ধি হইবে না। তোমার পিতা, মাতা, পুত্র, কলত্র প্রভৃতি কেহ আছে কি না, তোমার কোন কর্ত্তব্য আছে কি না, বা কোন সম্ভোগের বিষয় আছে কি না, বা কাহারও কৃত কোন অপকারের প্রতিশোধ লইতে হইবে, এই সকল কিছুই তোমার তৎকালে জ্ঞান হইবে না। তোমার অভ্যন্তরে বাহিরে, ঊর্দ্ধে বা নিম্নে কি হইতেছে, তাহাও তোমার উপলব্ধি হইবে না। যাহারা তোমাকে জড় বা অলস বলিয়া বিবেচনা করিবে, সেইটি তাহাদিগের ভ্রম। বরং তোমাকে একমাত্র কার্য্যক্ষম, ব্রহ্মাণ্ড মধ্যে সিদ্ধিলাভে একমাত্র বীর, একমাত্র দৈবীশক্তি-সম্পন্ন, একমাত্র জাগ্রত আধ্যাত্মিক জীব, এই অনন্ত বিশ্বের একমাত্র অনন্ত অধীশ্বর বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। এই অনন্ত বিশ্ব-মধ্যে তোমার জ্ঞানাকাশ-স্বরূপই, পঞ্চবিধ জ্ঞানশক্তি বিশিষ্ট একমাত্র চক্ষু।

চিন্তাশূন্য সেই দৃষ্টি এই অনন্ত বিশ্বের দৃশ্য-বস্তু সমূহে কেবল সাক্ষীরূপে বিক্ষিপ্ত হয়; সেই জ্ঞানস্বরূপ দৃষ্টি সর্ব্বত্র ব্যাপক-মাত্র ভাবে বিস্তীর্ণ হইয়া সকল বস্তুকেই আত্মভাবে গ্রহণ করে। সেই দৃষ্টি কেবল সাক্ষিমাত্র ও আনন্দ মাত্র। অতএব তুমি তৎকালে বিশ্বব্যাপী একমাত্র স্বয়ং প্রকাশ পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়-রূপে অনন্ত বিশ্বব্যাপী ভিন্ন আর কিছুই নহ। এই কালে তুমি, চন্দ্র সূর্য্য তারকামণ্ডিত এই ব্রহ্মাণ্ড মণ্ডল, তোমার লিঙ্গ স্বরূপে (সূক্ষ্ম দেহে) ব্যাপ্ত করিয়া অনন্ত আত্মা রূপে অবস্থিতি করিবে। এই কালে তুমি চরিত্রে ও সামাজিকতায় ঈশ্বর-তুল্য হইবে, এবং ঈশ্বর তত্ত্বে পূর্ণ যোগী হইবে। একমাত্র সত্যের আদর্শ, গুণময়, আত্মময়, এবং ভোগ্যবস্তুর আসক্তি রহিত হইবে। তুমি প্রকৃত সত্তার পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইবে। তোমার আত্মা সংসার পাশ হইতে বিনির্মুক্ত হইয়া অনন্ত আত্মাতে লীন হইবে। তোমার শারীরিক জীবনী শক্তির আর ক্ষয় হইবে না, এবং প্রশান্ত ভাবে অবিচলিত চিত্তে ধ্যানে সমর্থ হইবে। তৎকালে তুমি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান এই ত্রিলোকের জ্ঞাতা হইবে।

তুমি সর্ব্বজীবের সমস্ত কল্পনা ও ভাব বৃত্তির সাক্ষী, এমন কি অনন্ত বিশ্বের আত্মাস্বরূপ হইবে। তুমি স্বার্থ পদবী হইতে নিঃস্বার্থ পদবীতে, ইন্দ্রিয়াসক্তি হইতে নিরিন্দ্রিয় পদবীতে, আরোহণ করিবে, এবং নির্ব্বাণ বা জীবন্মুক্তির তীরে উপনীত হইবে। ইহাই একমাত্র আধ্যাত্মিক অবস্থা, ইহাই সমাধির পরাকাষ্ঠা। তুমি সকল পদার্থের সহিত একীভাব হইয়াও ভিন্নরূপে অবস্থিতি করিবে। তুমি ভ্রান্তিময়-মূর্ত্তি বিশিষ্ট এই

বিকারাত্মক জগৎকে অতিক্রম করিয়া স্বয়ংপূর্ণ প্রকৃত সত্য পদার্থ প্রাপ্ত হইবে। তোমার রিপু সমস্ত দূরীভূত, ও দূষিত ক্রিয়া সকল নির্ম্মূলিত ও শান্তিতে পূর্ণ, এবং বহির্ভাগ কলঙ্ক রহিত হইবে। তুমি ক্ষয় ও মৃত্যু রহিত হইয়া নিত্য সুখস্বরূপ হইবে, এবং সকল দুঃখের অবসান স্থল, শান্তির গৃহ, এমন কি স্বয়ং স্বর্গ-স্বরূপ হইবে। অমৃত, অপবর্গ, কৈবল্য বা মোক্ষ প্রাপ্ত হইবে। পাপ হইতে, সংসার পাশ হইতে এবং জন্ম পাশ হইতে পরিত্রাণ পাইবে। ব্রহ্মানন্দ স্বরূপ, প্রশান্ত সুখ স্বরূপ, নির্ম্মল ও স্বয়ং-পূর্ণ হইবে। স্বার্থভাব শূন্য হইবে, অহং জ্ঞান আর স্ফূর্ত্তি পাইবে না। তোমার সম্বন্ধে স্থান ও কালের সত্তা লোপ হইবে, জড়দেহ আর তোমার বিঘ্ন জন্মাইতে পারিবে না, এবং ধ্যানে তোমার শ্রান্তি বোধ হইবে না। তুমি নির্ব্বাত-কালীন দীপশিখার ন্যায় প্রশান্ত ও নিশ্চলভাবে দীপ্তি পাইবে। আত্মার বন্ধন-স্বরূপ অজ্ঞান আর তোমাতে প্রকাশ পাইবে না, মুক্তস্বরূপ বিজ্ঞানময় ভাব প্রকাশ পাইবে। তুমি সুখে দুঃখে, আশা বা নিরাশায় সমভাবে থাকিবে; দরিদ্র ও ধনীকে, সমভাবে দেখিবে। তখন তুমি শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্যের ন্যায় এই মন্ত্র পাঠে অধিকারী হইবে।

নির্ব্বাণ।

মনোবুদ্ধ্যহঙ্কার-চিত্তাদি নাহম্
ন শ্রোত্রম্ ন জিহ্বা নচ ঘ্রাণ-নেত্রম্।
নচ ব্যোম ভূমি র্ন তেজো ন বায়ু
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোহংম্ শিবোহহম্। ১।

অহম্ প্রাণ-সংজ্ঞো নাতি পঞ্চ বায়ু
র্নবা সপ্তধাতু র্নবা পঞ্চ কোশাঃ॥
নবাক্যানি পাদো নচোপস্থ পায়ু
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্। ২।
ন পুণ্যম্ ন পাপম্ ন সৌখ্যম্ ন দুঃখম্
ন মন্ত্রম্ ন তীর্থম্ ন বেদো ন যজ্ঞঃ।
অহম্ ভোজনম্ নৈব ভোজ্যন্ন ভোক্তা
চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্। ৩।
নমে দ্বেষ রাগৌনমে লোভ মোহো
মদো নৈব মে নৈব মাৎসর্য্য ভাবম্॥
ন ধর্ম্মো ন চার্থো ন কামো ন মোক্ষ
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্। ৪।
ন মৃত্যু র্নশঙ্কা নমে জাতি ভেদঃ
পিতা নৈব মে নৈব মাতা ন জন্ম।
ন বন্ধু র্ন মিত্রম্ গুরুর্নৈব শিষ্য
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্। ৫।
অহম্ নির্ব্বিকল্পো নিরাকার রূপো
বিভূর্ব্ব্যাপী সর্ব্বত্র সর্ব্বেন্দ্রিয়াণাম্।
ন বা বন্ধনম্ নৈব মুক্তি র্ন ভীতি
শ্চিদানন্দ রূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্। ৬।

৫৭। ৫৮ পৃষ্ঠায় অনন্ত আত্মার নিষ্ক্রিয় ভাব হইতে দ্বাদশ অবভাসের আবির্ভাব যেরূপে বর্ণিত হইয়াছে, সেইটি প্রকৃত অনুবাদ নহে। বুঝিবার সুলভের জন্য সেইরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু ঐ ভাবের প্রকৃত অনুবাদ যেরূপ হওয়া উচিত তাহা

পাঠক-মণ্ডলীর জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক, এজন্য নিম্নে বর্ণিত হইল।

প্রথমতঃ। চিৎ বা জ্ঞান-তন্মাত্রের স্বয়ং প্রকাশ।

দ্বিতীয়। বিজ্ঞান বা বুদ্ধি তন্মাত্র-রূপ আত্মাবভাস।

তৃতীয়। জ্ঞান তন্মাত্র-রূপে আত্মাবভাস।

চতুর্থ। প্রজ্ঞা-তন্মাত্র-রূপে আত্মাবভাস।

পঞ্চম। স্মৃতি তন্মাত্র-রূপে আত্মাবভাস।

ষষ্ঠ। চিত্ত-তন্মাত্র-রূপে আত্মাবভাস।

সপ্তম। বাসনা ও কল্পনা তন্মাত্র-রূপ আত্মাবভাস।

অষ্টম। বিবেচনা তন্মাত্র-রূপ আত্মাবভাস।

নবম। ব্যবসায়াত্মিকা-বুদ্ধি বা বিচার-বৃত্তি তন্মাত্র-রূপ আত্মাবভাস।

দশম। রিপু ও ভাব তন্মাত্র-রূপ আত্মাবভাস।

একাদশ। জ্ঞানেন্দ্রিয় তন্মাত্র-রূপ আত্মাবভাস।

দ্বাদশ। প্রাকৃতিক এবং ভৌতিক তন্মাত্র-রূপ আত্মাবভাস।

দ্বিতীয় খণ্ড।

অনুক্রান্ত উপদেশ।

জন্মান্তর শঙ্কা।

১। প্রত্যক্ষ, সৎমাত্র বিজ্ঞানময়, প্রকাশ-স্বরূপ সর্ব্বব্যাপী, সাক্ষিস্বরূপ সর্ব্বাতীত ব্রহ্মের বিশুদ্ধ আত্মভাব, ভ্রান্তি বা কল্পনা সহকারে অনিত্য অজ্ঞান অসৎ অনাত্মভাবে প্রকাশ পাইতেছে।

২ এই ভ্রান্তির অবস্থায় অজ্ঞান হইতে নামরূপ বিশিষ্ট বস্তু সমুদয় সমুদ্ভূত হইয়াছে। সেই অজ্ঞান জন্যই আদি অন্ত বিশিষ্ট জীব পরমাত্মা ইহাতে ভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইতেছে। এইরূপে পরমাত্মজ্যোতিঃ দ্বাদশ অবস্থায় পরিণত হইয়া, দ্বাদশ-বিধ আধ্যাত্মিক প্রতিভা বা দ্বাদশ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছে। এই দ্বাদশ বিধ তত্ত্ব হইতে সহস্র সহস্র তত্ত্ব সমুদ্ভূত হইয়াছে। এইরূপে পরমাত্ম তত্ত্ব ভ্রান্তি-মায়া এবং বৃত্তি-উৎপত্তি জনিত, একত্ব হইতে নানা প্রকার অবস্থায় উপনীত হইয়াছে। ৩ অজ্ঞানের এই অবস্থা হইতে অহঙ্কার বা অহংভাব অর্থাৎ আমি এবং আমার, এই ভাব উৎপত্তি হইয়াছে। এই অবস্থায় সকল প্রকার দুর্ভাবনা, এবং সুখ লাভের উপায়-চিন্তা উপস্থিত হয়। এইরূপে পরমাত্ম-তত্ত্ব প্রথমতঃ তত্ত্ব-বৃত্তিতে, দ্বিতীয়তঃ স্বীয়-আনন্দ-বিচার-বৃত্তি-উৎপত্তিতে, অবনত হইল। ৪ এই অবস্থায় আত্ম-প্রেম, আত্ম-বিশ্বাস এবং ইন্দ্রিয়-সুখে রতি জন্মে। তজ্জন্য প্রথমতঃ অবিবেক, দ্বিতীয়তঃ অজ্ঞতা, তৃতীয়তঃ আত্মাভিমান এবং চতুর্থতঃ রাগদ্বেষাদি ভাব-বৃত্তির উৎপত্তি হয়। ৫ এই সকলের দ্বারা অন্তঃকরণ দুর্ব্বল ও দূষিত হইয়া পড়ে। ৬ অন্তঃকরণের সেই অবস্থাই জন্মান্তরের হেতু। ৭ জন্মান্তর হইলেই পুণ্য, পাপের ফলভোগ করিতে হয়। ৮ ঈশ্বরের ও তাঁহার সৃষ্টির প্রতি কর্ত্তব্যের ত্রুটি জন্মিলে, মৃত্যু-যাতনা ঘটিয়া থাকে। মৃত্যু হইলে জন্ম-যাতনা অপরিহার্য্য।

এইরূপে জীব জন্ম-মৃত্যুর দ্বারা পুনঃ পুনঃ বিকৃত হইয়া, স্বীয় বিশুদ্ধ ভাব হইতে পরিচ্যুত হয়। সেই ভাব পুনরায় লাভ করিতে হইলে, বহুবিধ ক্লেশ সহ্য ও যত্ন প্রয়োজন। এই

জন্য প্রত্যক্ষ উপদেষ্টা জ্ঞান ও বিজ্ঞানতত্ত্ব, এবং পরোক্ষ উপদেষ্টা আধ্যাত্মিক গুরুর, আশ্রয় গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। তাঁহাদিগের নিকট শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন ও সমাধান, মুক্তির কারণ এই চারিটি অভ্যাস করিতে শিক্ষা করিবে।

প্রথমতঃ। পাপের জন্য অনুতাপ করিবে।

দ্বিতীয়তঃ। সর্ব্বদা মৃত্যুশঙ্কা, এবং ঈশ্বর ও জীবের প্রতি কর্ত্তব্য সম্পাদনে তৎপর হইবে।

তৃতীয়তঃ। পাপের ফলভোগে ভয়ের আতিশয্য থাকিবে।

চতুর্থতঃ। জন্মান্তর গ্রহণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার সংকল্পের আতিশয্য থাকিবে।

পঞ্চম। পরমাত্মার বিশ্বব্যাপকত্ব ভাবে বিশ্বাস, এবং যিনি ব্রহ্মসাক্ষাৎকার জন্য জ্ঞান-নেত্র উন্মীলিত করিয়া দেন, সেই গুরুস্বামীর প্রতি প্রেম ও ভক্তির আতিশয্য থাকিবে।

ষষ্ঠ। অন্তঃকরণে বিশুদ্ধ ভাবের আতিশয্য থাকিবে।

সপ্তম। ভ্রান্তি-তত্ত্ব বিচারের দ্বারা সত্যের অনুসন্ধানার্থ প্রবৃত্তি বৃদ্ধি করিবে। সেই সকল তত্ত্ব প্রকৃত কি ভ্রান্তিময় এবং পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার পৃথক সত্তা আছে কি না, তাহার মীমাংসা করিবে।

অষ্টম। তত্ত্ব এবং জীবাত্মা বা ভ্রান্তির অভাব-জ্ঞান বর্দ্ধন করিবে।

নবম। পরমাত্ম-ভাব বা বিশুদ্ধ ভাবের চরম সীমা লাভের জন্য অভ্যাস বৃদ্ধি করিবে।

পরমাত্মাকে ও যে আত্মশক্তি দেহের অভ্যন্তরে বৃত্তাকারে অবরোহণ ও আরোহণ করিতেছে, সেই শক্তিকে অনুসন্ধান

কর। তাহাকে নিষ্কাম্যব্রহ্মজ্ঞান-ভাবনা-উপাসনা, শিবরাজ-যোগ-সাধনা, বা পরোক্ষ জ্ঞানানুভব, বা পরোক্ষ-জ্ঞানযোগ অনুভব বলে।

সুখাসনে অবিচলিত ভাবে অর্দ্ধদণ্ডকাল উপবিষ্ট থাকিতে, অথবা প্রথম হইতেই চিত্র-প্রদর্শিত পদ্মাসনে উপবিষ্ট হইতে, অভ্যাস করিবে। শ্রবণ-মনোহর শব্দ বিশিষ্ট দর্শন-মনোহর স্থানে, গুহা-মধ্যে কঙ্করাদি বর্জ্জিত সমতল ভূমিতে, আসীন হইবে। শিরোদেশ ও গ্রীবা দেশ শরীরের অন্যান্য ভাগের সহিত সমভাবে রাখিয়া, অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয়গণকে হৃদয়-মধ্যে ধারণ করিবে। জ্ঞানীব্যক্তি ওঁকাররূপ নৌকার দ্বারা সংসার রূপ স্রোতঃ উত্তীর্ণ হইবে।

পূর্ব্বোক্ত রূপে সুখাসনে উপবিষ্ট হইয়া তোমার নেত্রদ্বয়ের প্রকৃত দৃষ্টিজ্যোতিকে অভ্যন্তরে চালিত করিয়া কুণ্ডলীতে নিঃক্ষেপ কর। সেই দৃষ্টি তীক্ষ্ণ দৈবীদৃষ্টি বলিয়া জ্ঞান হইবে। এই স্থানে সুষুম্না নাড়ী লিঙ্গমূলে সংযোজিত হইয়া মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ পূর্ব্বক উর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছে। এই দৃষ্টি এরূপে নিঃক্ষেপ করিতে হইবে, যেন দুইটি দৃষ্টির তীব্রতা বা দৃষ্টি-শক্তির জ্ঞান বা চেতন সুষুম্নার দুই পার্শ্বস্থ ছিদ্রের মধ্য হইয়া, অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলার মধ্য হইয়া, কুণ্ডলীর অতি নিম্ন প্রান্তে অবরোহণ করে। অর্দ্ধ নিমীলিত নেত্রে দূরস্থ বস্তুতে একাগ্র-চিত্তে দৃষ্টিক্ষেপ করিলে যে একটু অনির্ব্বচনীয় দৃষ্টির ভাব জন্মে, তাহাকেই দৃষ্টির তীব্রতা বলে।

এক্ষণে মনকে একটি সরল শলাকা বলিয়া কল্পনা কর। ইহার উর্দ্ধভাগ ব্রহ্মরন্ধ্র মধ্যে এবং অধোভাগ কুণ্ডলীমধ্যে

স্থাপিত। অনুমান কর যে মানসিক বা চেতনময় দৃষ্টি এই শলাকার অধোভাগে স্থিত। এক্ষণে নেত্রদ্বয়ের তীব্র দৃষ্টি অর্থাৎ কল্পিত জ্ঞানাকাশ স্বরূপ দৃষ্টির দ্বারা, মনোময় দৃশ্য কুণ্ডলীকে গ্রহণ কর, এবং ঐ দুই দৃষ্টিরূপ সন্দংশনীর দ্বারা তাঁহাকে ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলন কর। সেই মনোময় বোধশক্তিকে এই প্রকারে আরোহণ করাইতে অন্যূন এক দণ্ড কাল সময় ক্ষেপণ করিবে। ব্রহ্মরন্ধ্রে লইয়া যাইয়া সেই স্থানেও এই বোধশক্তিকে অন্যূন একদণ্ড কাল ধারণা করিবে। পরে সেই শক্তিকে নিমেষকাল মধ্যে কুণ্ডলীতে অধঃক্ষিপ্ত করিয়া পুনরায় ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলন করিবে। এইরূপ অবরোহণ ও আরোহণে নিমেষ মাত্রের অধিক কাল না লাগে, এবং সুষুম্না-যন্ত্রের মধ্য-নাড়ীর মধ্যে এইরূপ অবরোহণ-আরোহণ ক্রিয়া সাধিত হইবে। এই নাড়ীই পূর্ব্বে মনোময় শলাকা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

কিছুক্ষণ এইরূপ অভ্যাস করিয়া তোমার মনকে ঐ শলাকার উপরিভাগে সরলভাবে স্থাপন করিবে, যেন পাষাণময় শলাকার উপরে অবিচলিত ভাবে স্থাপিত হইল। পুনরায় অবরোহণ না করিয়া সেই স্থানেই অচলভাবে থাকিবে। চিন্তা বা চিত্তের লঘুতা বা গতি পরিত্যাগ করিয়া চিত্তকে প্রশান্ত, শূন্য ও মৃতভাবে স্থাপিত রাখিবে।

পূর্ব্বোক্ত প্রণালীক্রমে মনকে বা নিত্য চেতনময় দৃষ্টিকে শলাকার ন্যায় ঋজু ও অবিচলিতভাবে স্থাপন করা অভ্যস্ত হইলে, ব্রহ্মরন্ধ্র-মধ্যে মনের উপরিভাগে দুই চক্ষের জ্ঞানময় দৃষ্টি যোজনা কর। ইহাতে একটি ত্রিভুজ ক্ষেত্র যেন অঙ্কিত

হইল। মন ইহার উপরিস্থ কোণ এবং পূর্ব্বোক্ত রূপে সংযোজিত দুইটি জ্ঞানময় দৃষ্টি ইহার বাহুদ্বয়।

পূর্ব্বোক্ত অভ্যাসে সিদ্ধি লাভ হইলে, একাগ্রভাবে চিন্তা কর যেন চক্ষু, কর্ণ, মুখ, নাসিকা প্রভৃতি অবয়ব-বিশিষ্ট তোমার মস্তক নাই, বা অন্তরিত হইয়াছে। সেই সকল অবয়ব বিশিষ্ট মস্তকের পরিবর্ত্তে সেই স্থান বিশ্বব্যাপী চেতন বা জ্ঞানাকাশের দ্বারা পরিপূর্ণ হইয়াছে। সেই জ্ঞানাকাশই এক্ষণে স্বয়ং বিশুদ্ধ আকাশরূপে পরিণত।

ব্রহ্ম জ্ঞানাকাশ। ইহা সম্পূর্ণ জ্ঞান ও শূন্যমাত্র অথবা সর্ব্বশূন্য জ্ঞানাকাশ মাত্র। ইহা অন্ধকারময় বা আলোকময় নহে, কেবল মাত্র প্রকাশময়। ইহা বর্ণ বা উপমা রহিত, নির্ম্মল বিজ্ঞানময় সর্ব্বব্যাপী চেতনে পরিপূর্ণ, অথবা সর্ব্বজ্ঞান ব্যাপক মাত্র। ইহাই আধ্যাত্মিক সাক্ষি মাত্র বা শুদ্ধ জ্ঞান-সাক্ষি মাত্র। ইহা পবিত্র, নিত্য সুখ-স্বরূপ, বা সর্ব্বোপরি সত্য ব্রহ্মজ্ঞানানন্দ মাত্র। ইহা মধুচ্ছিষ্ট-নির্ম্মিত বর্ত্তিদণ্ড-নিঃসৃত আলোকের ন্যায় নির্ম্মল। (১) এই আলোক আপন মণ্ডল মধ্যে সম্পূর্ণ ব্যাপ্তভাবে অবস্থিত। (২) ইহা শূন্য স্বরূপ, কারণ ইহাতে কিছুই দৃষ্ট হয় না, ইহাতে কিছুই পাওয়া যায় না, বা ইহাতে কিছুই স্থাপন করা যায় না। (৩) ইহা বিশ্বব্যাপী জ্ঞান মাত্র বা জ্ঞান-ব্যাপক স্বরূপ, কারণ ইহার আলোক সর্ব্বদিকে সর্ব্বত্র প্রসারিত হয়। (৪) ইহা স্বয়ং সাক্ষি স্বরূপ, কারণ এই জ্ঞানালোক সকল বস্তুর উপর বিস্তৃত এবং সকলেরই অন্তর্বাহ্য প্রকাশ করে। ইহা সেই স্থানের সাক্ষি মাত্র, তথায় যাহা ঘটিয়াছে যাহা ঘটিতেছে ও যাহা ঘটিবে তৎসমুদায়েরই জ্ঞাতা।

বিশুদ্ধ অকাশকে এই চারিভাবে চিন্তা করিবে এবং এই চারি ভাবকে বিশুদ্ধ আকাশ হইতে কোন প্রকারে ভিন্ন জ্ঞান করিবে না।

এই রহস্য বা গূঢ় ভাব একাকারে সর্ব্বত্রব্যাপী। এই জ্ঞানালোক মধ্যে যদি ভ্রান্তি বা কল্পনার সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত কর, তবে তাহাকেও ইহা প্রকাশ করিবে, অথবা যদি অভ্রান্তির সৃষ্টি প্রবর্ত্তিত কর, তথাপিও ইহা স্বয়ং প্রকাশ রূপে সর্ব্বত্র বর্ত্তমান থাকিবে। অতএব এই বিশুদ্ধ জ্ঞানকে অবচ্ছিন্ন বলিয়া বিবেচনা করিবে না। ইহা অনন্ত,—দক্ষিণে, বামে, উপরিভাগে, অধোভাগে, সম্মুখে, পশ্চাতে, সর্ব্বত্র অসীমভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে। অতএব এই শিরোমণ্ডল-স্থিত জ্ঞানাকাশকে অবচ্ছিন্ন বলিয়া বিবেচনা না করিয়া, সর্ব্বব্যাপী চেতন-মণ্ডল বা জ্ঞান স্বরূপ বলিয়া চিন্তা করিবে।

এক্ষণে তোমার বিজ্ঞান-মণ্ডলে বা চেতন-শক্তিতে বা সর্ব্বসাক্ষি জ্ঞানাকাশ স্বরূপে চিন্তা কর, যে সর্ব্বসাক্ষি অনন্ত জ্ঞানাকাশ-মণ্ডলের মধ্যস্থানে কিঞ্চিৎ অধোভাগে জীব-পূর্ণ পৃথিবী ভাসিতেছে, মধ্যস্থানের কিঞ্চিৎ উপরিভাগে, দক্ষিণে সূর্য্য, বামে চন্দ্র এবং উপরিভাগে গ্রহ নক্ষত্রগণ প্রকাশ পাইতেছে।

এক্ষণে সাক্ষিস্বরূপ ব্যাপক ও শূন্যমাত্র তোমার বিশ্বব্যাপী বিশুদ্ধ জ্ঞানাকাশ-স্বরূপকে এরূপে প্রসারিত কর, যেন চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র ও পৃথিবী আদি সমুদয় লোক, ও তাহাদিগের উপরিস্থ সৃষ্টি জীবসমুদয়কে ওতপ্রোত ভাবে ব্যাপ্ত করে। যেন তাহাদিগের অন্তরে বা বাহিরে জ্ঞানাকাশের সত্তাশূন্য

স্থান না থাকে। এই অভ্যাস দ্বারা তুমি সর্ব্বশূন্যময়, অনন্ত সর্ব্বত্র ব্যাপী সর্ব্বসাক্ষি স্বয়ং জ্ঞানরূপ ভাবে সিদ্ধি লাভ করিবে। এই শুদ্ধ চৈতন্য জ্ঞানাকাশ-স্বরূপ স্বয়ং-ব্যাপী অনন্ত আত্মার অনন্ত অবকাশ-মধ্যে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র ভূর্লোকাদি সমস্তই প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। এই অভ্যাসকে তুমি ব্রহ্মজ্ঞানানুভব বলিয়া জানিবে। এই জ্ঞানাকাশই বিশুদ্ধ আকাশ বা শুদ্ধ চৈতন্য-আকাশ। ইহা বর্ণবিশিষ্ট অন্ধকারময় বা আলোকময় সামান্য আকাশ নহে। এই দৃশ্যময় আকাশ মিথ্যা, জ্ঞানাকাশই সত্য, ইহাই চিন্তনীয়। জ্ঞানাকাশে বর্ণ নাই, অন্ধকার বা আলোক নাই, সম্পূর্ণ শূন্যমাত্র। চিন্তাকালে দৃশ্যময় মিথ্যা আকাশ পরিত্যাগ করিতে যেন জ্ঞানাকাশকেও পরিত্যাগ করিও না। তাহা হইলে তুমি ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিবে না। জ্ঞানাকাশ ব্যতিরেকে অন্য সকল আকাশকে আকাশের মায়া-ঘটিত প্রতিমূর্ত্তি বলিয়া জানিবে। তোমার অন্তঃকরণ মলিন পাপ-পূর্ণ প্রযুক্ত ঐ সকল আকাশ সত্য বলিয়া প্রকাশ পায়। ঐ সকল আকাশকে এই বলিয়া বর্জ্জন করিবে "তোমরা আমার প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান আকাশস্বরূপ নহ।

পূর্ব্বোক্ত ধ্যান প্রণালীর সংক্ষেপে বর্ণন।

১। নেত্রদ্বয় নিমীলিত করিয়া তাহাদিগের জ্ঞানময় তীব্র-দৃষ্টি কুণ্ডলীতে স্থাপন কর।

২। মনকে শলাকার ন্যায় চিন্তা কর ও মনোময় চেতনাকে কুণ্ডলীতে স্থাপন কর।

৩। সেই কুণ্ডলী-স্থিত মনকে নেত্রদ্বয়ের তীব্র জ্ঞানময়-দৃষ্টির দ্বারা ক্রমে ক্রমে ব্রহ্মরন্ধ্রে উত্তোলন কর। পুনর্ব্বার কুণ্ডলীতে নিঃক্ষেপ করিয়া পুনর্ব্বার উত্তোলন কর। এইরূপ পুনঃ পুনঃ করিবে।

৪। চেতনকে ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন করিয়া মনকে শলাকার ন্যায় সরল ও অবিচলিত ভাবে রাখিবে।

৫। নেত্রদ্বয়ের জ্ঞানময় দৃষ্টি ব্রহ্মরন্ধ্রস্থ চেতনে যোজনা করিবে।

৬। মস্তক অন্তর্হিত হইয়াছে ও সেই স্থান জ্ঞানাকাশে বা আধ্যাত্মিক চেতনে পরিপূর্ণ হইয়াছে, এইরূপ চিন্তা করিবে।

৭। এই জ্ঞানাকাশকে ব্রহ্মাণ্ডাকারে প্রসারিত করিয়া, তাহার অভ্যন্তরে চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্র পৃথিবী প্রভৃতি ভাসমান রহিয়াছে, এবং জ্ঞানাকাশ তাহাদিগের সকলের বাহিরে ও অভ্যন্তরে ব্যাপ্ত রহিয়াছে, এই রূপ চিন্তা করিবে।

কিছুদিন এইরূপ অভ্যাস করিয়া সিদ্ধি লাভ করিলে, তুমি ভাবনা-ব্রহ্মজ্ঞানী-ব্রহ্মচারী হইবে।

দৈব-তীর্থে ভ্রমণ। এইরূপে ব্রহ্ম-রন্ধ্রের অভ্যন্তরে ভাবনা ব্রহ্ম-জ্ঞান চিন্তা করিবে। এক্ষণে কিরূপে শুদ্ধ চৈতন্য ব্রহ্ম-জ্ঞানাকাশ-ময় সুষুম্না-পথে গমন করিয়া কুণ্ডলীতে অবরোহণ করিতেছে এবং কুম্ভক-পথে প্রবেশ পূর্ব্বক ব্রহ্ম-রন্ধ্রে আরোহণ করিতেছে, এইটি অনুসন্ধান করিবার জন্য তোমার দেহরূপ ব্রহ্মাণ্ডে সুষুম্নারূপ দেবতীর্থ-ভ্রমণে যাত্রা কর। এই অবরোহণ ও আরোহণ ক্রিয়ার দ্বারা আমরণকাল তোমার সমুদায় দেহ-যন্ত্র পালিত হইতেছে। এই অভ্যাস তোমার সেই যোগের সহায়

হইবে, যদ্বারা তুমি লয়-বোধ বা সমাধি-জ্ঞান লাভ করিয়া অনন্ত কালের জন্য শুদ্ধ-চৈতন্যময় ব্রহ্মজ্ঞানাকাশে লীন হইবে।

অতএব চিন্তা কর যে সুষুম্না-নাড়ী-মধ্যে ব্রহ্ম-চৈতন্য জ্ঞানাকাশ স্বরূপ প্রবাহিত হইতেছে। সুষুম্না-নাড়ী—একটি অন্তঃশূন্য নাড়ী, ইহার অভ্যন্তরে তিনটী ক্ষুদ্র নাড়ী আছে। ইহা শিরঃকপালের মধ্যস্থান হইতে সমুদ্ভূত হইয়া মস্তিষ্কের মধ্য-স্থল হইতে কুণ্ডলীতে অবরোহণ করিয়াছে। সুষুম্নার অন্তর্গত এই তিন নাড়ীর অভ্যন্তরেই জ্ঞানাকাশ প্রবাহিত হয়।

(১) সুষুম্না যন্ত্রের বামভাগ-স্থিতা ইড়াকলা নাম্নী নাড়ীর মধ্যে (চিং সং ১) জ্ঞানাকাশের তৃতীয়াংশ প্রবাহিত হয়। সেই প্রবাহের নাম প্রণব-উগ্র-চন্দ্রকলাবসী, অথবা ব্রহ্ম-চৈতন্য-শুদ্ধ-সম্পূর্ণ-স্বয়ং-প্রকাশ দৃষ্টি; বা আত্ম-স্বরূপ দৈব-জ্যোতিঃ। সুষুম্না-নাম্নী মধ্য-নাড়ী (চিং সং ২)। ইহার মধ্যে যে তৃতীয়াংশ জ্ঞানাকাশ প্রবাহিত হয়, তাহার নাম নিরাকার যোগিক্য (অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দৈবী দৃষ্টি) অগ্নিকলাবসী, অথবা ব্রহ্ম-চৈতন্য-শুদ্ধ-জ্ঞানাকাশ-সর্ব্বাঙ্গিত্ব-সর্ব্ব-জ্ঞান দৃষ্টি। (৩) দক্ষিণ ভাগস্থিতা নাড়ীকে পিঙ্গলা বলে। ইহার মধ্যে তৃতীয়াংশ জ্ঞানাকাশ প্রবাহিত হয়। তাঁহাকে আধ্যাত্মিক দৃষ্টি বা ওঁকার রূপা-সূর্য্যকলা-বসী অথবা ব্রহ্ম-চৈতন্য শুদ্ধ জ্ঞানাকাশ সর্ব্ব-যাথিক্তি সর্ব্ব-শূন্য-দৃষ্টি বলে।

অনুমান কর যে শিরঃকপালের মধ্যস্থল হইতে জ্ঞানাকাশ সম্ভূত হইয়া, এক ইঞ্চের অষ্টমাংশ অন্তরে মস্তিষ্কের উপরিভাগে অবস্থাপিত, এইটি শূন্য স্থান, ইহাকে ব্রহ্ম-রন্ধ্র বলে। মস্তিষ্কের উপরিভাগ হইতে মধ্যস্থলে, এক ইঞ্চের অষ্টমাংশ অন্তরে, এবং

মধ্যস্থল হইতে এক ইঞ্চের অষ্টমাংশ অন্তরে, মস্তিষ্কের তল-প্রদেশে অবরোহণ করিয়াছে। মস্তিষ্কের তল-প্রদেশ হইতে, এক ইঞ্চের অষ্টমাংশ অন্তরে, ললাটের মধ্যস্থলে, এবং ললাটের মধ্যস্থল হইতে এক ইঞ্চের অষ্টমাংশ অন্তরে ভ্রূদ্বয়-মধ্যে, ইহা অবস্থিতি করিতেছে। ভ্রূদ্বয়ের মধ্যস্থল হইতে জ্ঞানাকাশ-প্রবাহিণী সুষুম্না তিন ধারায় বিভক্ত হইল। দুই পার্শ্বের দুই ধারা দুই নেত্রে প্রবিষ্ট হইল। এবং মধ্য-ধার নাসাগ্রের মধ্যস্থলে অবস্থিতি করিল। এই স্থানে তিন ধারা পুনরায় একত্র মিলিত হইয়াছে। নাসাগ্র হইতে এক ইঞ্চ মাত্র অবরোহণ করিয়া জিহ্বা-মধ্যে অবস্থিত হইল। জিহ্বা-মধ্য হইতে গল-নলীর পশ্চাদ্ভাগ হইয়া, অন্নবাহী স্রোতঃপথে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার মধ্য দিয়া গমন করিল। অন্নবাহী স্রোতে ইহার একটি শাখা প্রেরিত হইয়াছে। জিহ্বামধ্য হইতে দুই ইঞ্চ অধোভাগে কণ্ঠদেশে অবস্থিত, কণ্ঠদেশ হইতে ছয় ইঞ্চ অধোভাগে হৃদয়-মধ্যে অবস্থিত, হৃদয়-মধ্য হইতে ছয় ইঞ্চ অধোভাগে নাভি-মধ্যে অবস্থিত, এবং নাভি-মধ্য হইতে পাঁচ ইঞ্চ নিম্নে অবরোহণ করিয়া কুণ্ডলী-মধ্যে অবস্থিত। সেই স্থানে ইহা লিঙ্গমূলে মিলিত হইয়া, এবং অধোভাগে অবনত হইয়া উর্দ্ধে উন্নত হইয়াছে। এই নিমিত্ত এই স্থানকে কুণ্ডলী বলে। এক্ষণে ইহা কুম্ভক-যন্ত্রস্থ তিন নাড়ীর মধ্য দিয়া উর্দ্ধে গমন করিয়াছে। সুষুম্না নাড়ীর যে ভাগ মেরুদণ্ডের অভ্যন্তরে উর্দ্ধমুখে প্রবাহিত হইয়াছে, তাহাকেই কুম্ভক নাড়ী বলে। এস্থানে অধোবাহী জ্ঞানাকাশের প্রকৃতি পরিবর্ত্তিত হয়। এস্থানে ইড়াকন্দ নাড়ীকে রেচক নাড়ী বা অনন্ত-চেতন বলে।

সুষুম্না নাড়ীই কুণ্ডলীরূপে পরিণত হয়। ইহাকে কুণ্ডলী-ত্রিলকা-নিত্য-সম্পূর্ণ-আনন্দকলাময় কুম্ভক-নাড়ী বলে (চিং সং ৫)। অথবা ব্রহ্ম-চৈতন্য শুদ্ধ-শান্ত-সদাকাশ সর্ব্ব-লয়বোধ-পরিপূর্ণানন্দ অথবা নিত্যানন্দ-স্বরূপ বলে।

পিঙ্গলা নাড়ী এই স্থলে, কুণ্ডলী-কুম্ভিত-বোধ-পূর্ণ-সাক্ষী-কলাময় পূরক-নাড়ী (চিং সং ৬) বলিয়া, অথবা ব্রহ্ম-চৈতন্য শুদ্ধ শান্ত-আকাশ সর্ব্বস্থান সর্ব্বজ্ঞান সবব সাক্ষী-দৃষ্টি বা সম্পূর্ণ অনন্ত সাক্ষিরূপে অভিহিত।

চিন্তা কর যে এই তিন নাড়ী একত্র দ্রুত বেগে ব্রহ্মরন্ধ্রে আরোহণ করিয়া তথায় লীন হইতেছে, পরে পুনরায় অবরোহণ ও আরোহণ করিতেছে। যাবৎ ইহাতে সিদ্ধিলাভ না হয় তাবৎ এইরূপ দৈবীতীর্থে ভ্রমণ কিছুদিন অভ্যাস করিবে। তখন তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞানী শিবযোগ-যাত্রী, রাজযোগে ভাবনা-ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মচারী বলা যাইবে।

তোমার বাম হস্তের অঙ্গুলীর চিন্মুদ্রার দ্বারা চিন্তা কর যে তোমার জ্ঞানাকাশ অবরোহণ করিতেছে, দক্ষিণ হস্তের চিন্মুদ্রার দ্বারা চিন্তা কর যে আরোহণ করিতেছে এবং ব্রহ্ম-রন্ধ্র-স্থিত মনে নেত্রদ্বয়ের তীব্র জ্ঞানময় দৃষ্টি সংযোজনা দ্বারা যে চিন্মুদ্রা জন্মে, তদ্দ্বারা চিন্তা কর যে তোমার জ্ঞানাকাশ অনন্ত আত্মাতে লীন হইয়াছে। এই প্রণালী সুখাসনে বসিয়া অভ্যাস করিবে।

ব্রহ্মরন্ধ্র হইতে অবরোহণ কালে জীহ্বা সঞ্চালন না করিয়া তোমার জ্ঞানাকাশে চেতনার দ্বারা এই মন্ত্র উচ্চারণ করিবে। অর্থাৎ মৌন-জ্ঞান-দৃষ্টিমাত্র দ্বারা এই মন্ত্র পাঠ করিবে। শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিব শিবোঽহম্ ব্রহ্মোঽহম্ জ্ঞানো-

হম্‌ আকাশোঽহম্‌ শূন্যোঽহম্‌ সাক্ষ্যহম্‌ ব্যাপকোঽহম্‌ আনন্দোঽহম্‌। এবং আরোহন কালে এই দৈবী মন্ত্র পাঠ করিবে, লয়োঽহম্‌ বোধাঽহম্‌ শান্তোঽহম্‌ শুদ্ধোঽহম্‌ নিত্যো-ঽহম্‌ প্রণবোঽহম্‌ ওঁকারোঽহম্‌ নিরাকারোঽহম্‌ উগ্রোঽহম্‌ কৃপাকরম্‌ ঐক্যম্‌ আরোঽহম্‌ স্তম্ভনম্‌ কুম্ভিতম্‌ পরমনুভবম্‌ সম্পূর্ণম্‌ আগমআঙ্কহম্‌।

এই অভ্যাসে সিদ্ধিলাভ করিলে তুমি এক্ষণে তত্ত্বজ্ঞানী বা উৎপত্তি দর্শন গৃহস্থী হইবে; অর্থাৎ তুমি মায়া ভ্রান্তি কল্পনা সঙ্কল্প-তত্ব গৃহাশ্রম পরীক্ষণ বা বিচার করিবে, এবং তাহাদিগকে অকর্ম্মণ্য বা অনিষ্টকর জানিয়া, সমস্তই পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাসী মৌনজ্ঞানী হইবে। এই কালে তোমার ব্রহ্মজ্ঞান এরূপ দৃঢ় হইবে, যে মায়া আর তোমাকে স্পর্শ করিতেও পারিবে না।

তত্ত্বজ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞানানুভব।

তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য তুমি প্রথমতঃ চিন্তা কর যে সর্ব্ব-ব্যাপী অনন্ত-আত্মা বা ব্রহ্ম-চৈতন্য তোমার শিরঃ কপালের মধ্যস্থলে অবস্থিত। ইহাকে এক মাত্র জ্যোতিঃ, এক মাত্র স্বয়ং-প্রকাশ অখণ্ড কূটস্থ ব্রহ্ম বলিয়া চিন্তা কর। ইহা আত্মার আত্মা (পরমাত্মা), নির্ম্মল শুদ্ধ-সদাকাশ (নির্ম্মল এবং প্রকৃত আকাশ) অর্থাৎ সর্ব্ব-শূন্য মাত্র। ইহা সম্পূর্ণ বিশুদ্ধ-চেতন এবং বিজ্ঞান-স্বরূপ। ইহা একমাত্র দৈবী-সাক্ষী বা সর্ব্ব-সাক্ষী, একমাত্র নিত্যানন্দ স্বরূপ বা সর্ব্বানন্দ-ময়। এইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যকে,

সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড ও ব্রহ্মাণ্ডস্থ সমস্ত আত্মাতে পরিব্যাপ্ত বলিয়া চিন্তা কর।

দ্বিতীয়তঃ। মস্তিষ্কের উপরিভাগে আত্মাকে খণ্ড ও সান্ত বলিয়া চিন্তা করিবে। ইহা একটি ক্ষুদ্র আবরণের স্বরূপ। এইটি অনাদি সঙ্কল্প কল্পনা বা ভ্রান্তিরূপ আবরণ। ইহা অবিশুদ্ধ অসদ্ভাবযুক্ত। ইহার অস্তিত্ব পরমাত্মার ন্যায় নিত্য বলিয়া জানিবে। কিন্তু পরমাত্মা হইতে ইহার উৎপত্তি বা আবির্ভাব নহে। যেমন মেঘাগমে সূর্য্য-রশ্মি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয় ও তাহার স্থলে আমরা ছায়া দেখিতে পাই, সেইরূপ অনন্ত আত্মাতে সহসা এই আবরণের সমাগম হইলে, পরমাত্ম-ভাব আচ্ছন্ন হইয়া, অনন্ত আত্মা হইতে একটি ভিন্ন ভাবের অস্তিত্ব অর্থাৎ অহং জ্ঞান রূপ একটি মিথ্যা ভাব প্রকাশ পায়। এই অসদাত্মিকা মায়া অনন্ত-আত্মা হইতে সমুদ্ভূত বা সমাগত নহে। এই মায়া-ভ্রান্তির দ্বারা সত্যভাব আবৃত হইয়া অসৎ-ভাব প্রকাশ পায়। মায়ার আবরণে আবৃত হইবার পূর্ব্বে, পরমাত্মাতে এই অসৎ ভাবের অস্তিত্ব ছিল না, এই মায়ার আবরণ অপসৃত হইবা মাত্র পরেও থাকিবে না।

যেমন মেঘ অন্তর্হিত হইলে ছায়াও অন্তর্হিত হয়, সেই রূপ অনন্ত-আত্মার বিমল জ্যোতি প্রকাশ হইলে, এই মায়ার আবরণ অন্তর্হিত হয়। এই মায়াই এক মাত্র অখণ্ড আত্মাকে দ্বৈত-ভাবে খণ্ডিত করিয়াছে।

তৃতীয়তঃ। চিন্তা কর যে মায়ার আবরণ কর্তৃক মস্তিষ্কের মধ্যস্থলে অসৎ এবং ভ্রান্তিময় বিজ্ঞানাত্মা, অবিশুদ্ধ অসম্পূর্ণ খণ্ডিত সমল, ভৌতিক-ব্যাপারের সাক্ষী, এবং ক্ষণিক সুখের

ভোক্তা! অতএব এই স্থানে মায়ার আবরণ কর্ত্তৃক খণ্ডিত বিজ্ঞানাত্মারূপে বা তৎপরময় জীবাত্মারূপে অনন্ত-আত্মা প্রতি-ভাত হইতেছেন। বিবেচনা কর যে ইহা পূর্ব্বেও ছিল না ও পরে যখন কেবল অনন্ত আত্মা-মাত্র অবশিষ্ট থাকে তখনও থাকে না। অতএব বিবেচনা কর যে জীবাত্মা পূর্ব্বে ছিলনা, এখনও নাই, ও পরেও থাকিবে না। কেবল মায়া আত্মার স্বরূপ আবরণ করিয়া এক মাত্র অখণ্ড বস্তুতে দ্বৈতভাব প্রবর্ত্তিত করিয়াছে।

চতুর্থতঃ। চিন্তা কর যে পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মা মস্তিষ্কের তল-দেশে প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাতা রূপে প্রতিভাত হইতেছে। সেই স্থান হইতেই জীবাত্মা আধ্যাত্মিক বৃত্তি ও ভৌতিক বৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে।

পঞ্চম। চিন্তা কর যে ললাটের মধ্যস্থলে পূর্ব্বোক্ত জীব-স্মৃতির অধিষ্ঠাতা রূপে পরিণত। শারীরিক বৃত্তি-সম্বন্ধীয় স্থূল-বায়ু বিশিষ্ট এবং মানসিক বৃত্তি-সম্বন্ধীয় সূক্ষ্ম-বায়ু বা বশীবিশিষ্ট কারণ-শরীর এই স্থানে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া চিন্তা কর।

ষষ্ঠ। চিন্তা কর যে ভ্রূদ্বয় মধ্যে জীবাত্মা চিত্তবৃত্তির অধি-ষ্ঠাতা রূপে পরিণত হইয়াছে। এই স্থানে আশাগ্নি (প্রেমাগ্নি,) পাশাগ্নি (আসক্তিরূপ অগ্নি) মোহাগ্নি, ক্রোধ বা অভিমানাগ্নি এবং স্থূল উদরাগ্নি (ক্ষুধা বা তৃষাগ্নি) এই পঞ্চ অগ্নি-বিশিষ্ট সূক্ষ্ম-শরীর প্রতিষ্ঠিত।

সপ্তম। চিন্তা কর যে নাসাগ্র-মধ্যে পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মা অসংশ্লিষ্ট-কল্পনা বৃত্তির অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত। এই বৃত্তিকে

আবরণ—অজ্ঞান—অরূপ—শক্তি বলা যায়।

অষ্টম। চিন্তা কর যে জিহ্বা মধ্যে পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মা বিবেচনা-বৃত্তির অধিষ্ঠাতা রূপে পরিণত। ইহা তিন মূর্ত্তিতে আবির্ভূত, রজোগুণ বা ক্রিয়াত্মিকা বৃত্তির অধিষ্ঠাতা, তমোগুণ বা অজ্ঞান-বৃত্তির অধিষ্ঠাতা, সত্বগুণ বা সদ্বৃত্তির অধিষ্ঠাতা।

নবম। চিন্তা কর যে কণ্ঠ মধ্যে পূর্ব্বোক্ত জীবাত্মা অন্তঃ-করণ বৃত্তির অধিষ্ঠাতা রূপে পরিণত। এই অধিষ্ঠাতাতে এইরূপ আত্মাভিমান উপস্থিত হয় যথা,—আমি সকল বিষয়ে আছি, সকল বিষয় আমার, এবং আমার সকল বিষয়ে লিপ্ত থাকা কর্ত্তব্য।

দশম। চিন্তা কর যে হৃদয়ের মধ্যে জীবাত্মা অনুমান-বৃত্তির অধিষ্ঠাতা রূপে পরিণত হইয়াছেন। এই বৃত্তি চারি প্রকার যথা,—মনঃ, বুদ্ধি, চিত্ত, অহঙ্কার।

১১। চিন্তা কর যে নাভি-মধ্যে জীবাত্মা জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হইয়াছেন। শব্দেন্দ্রিয় অর্থাৎ শব্দ-সঞ্চারিণী, ও শব্দ-গ্রাহিণী-শক্তি, স্পর্শেন্দ্রিয়, দর্শনেন্দ্রিয়, রসনেন্দ্রিয়, এবং ঘ্রাণেন্দ্রিয়।

১২। চিন্তা কর যে কুণ্ডলী-মধ্যে জীবাত্মা ভৌতিক তত্ত্বের অধিষ্ঠাতারূপে পরিণত হইয়াছেন। আকাশ-তন্মাত্র, বায়ু-তন্মাত্র, অগ্নি-তন্মাত্র, রস-তন্মাত্র ও গন্ধ-তন্মাত্র, বা শুদ্ধ-সূক্ষ্ম-আকাশ, শুদ্ধ-সূক্ষ্ম-বায়ু, শুদ্ধ-সূক্ষ্ম-অগ্নি, শুদ্ধ-সূক্ষ্ম-জল এবং শুদ্ধ-সূক্ষ্ম-পৃথ্বী। সেই সূক্ষ্ম-আকাশ হইতে স্থূল দৃশ্যময় আকাশ, সূক্ষ্ম-বায়ু হইতে স্থূল দৃশ্যময় বায়ু, সূক্ষ্ম-অগ্নি হইতে এই স্থূল দৃশ্যময় অগ্নি, সূক্ষ্ম-রস মাত্র হইতে দৃশ্যময় জল এবং সূক্ষ্ম-পৃথ্বী হইতে স্থূল দৃশ্যময় পৃথ্বী

সম্ভুত হইয়াছে। এই তত্ত্বসমুদয়ের বিশেষ উপদেশ পরে অপবাদের শ্লোকে দেওয়া যাইতেছে। এই তত্ত্ব-জ্ঞানের দ্বারা তুমি গৃহস্থী হইবে।

অপবাদ বা তত্ত্ব-জ্ঞানের লয়।

ঈশ্বর-তত্ত্ব, মানসিক বিকার, জীব-তত্ত্ব ও শারীরিক বিকার, ত্যাগ করিতে অভ্যাস করা অথবা সর্ব্ব তত্ত্ব-দর্শন-নাশ-ত্যাগালয়-স্থান অপরোক্ষ জ্ঞানানুভব।

প্রথম। পরোক্ষ জ্ঞানানুভবের দ্বারা তুমি দর্শরূপ ব্রহ্মচারী অর্থাৎ আত্মদর্শী হইলে।

দ্বিতীয়। পরোক্ষ জ্ঞানযোগানুভবের দ্বারা তুমি দর্শরূপ ব্রহ্মচারী যাত্রী হইবে। আত্মাকে অনুভব করিয়া আত্মার অভিমুখে গমন করিতে আরম্ভ করিবে।

তৃতীয়। তত্ত্বজ্ঞান পরোক্ষ জ্ঞানানুভবের দ্বারা তুমি দর্শরূপ তত্ত্ব-জ্ঞান গৃহস্থী হইবে।

চতুর্থ। চতুর্থ অভ্যাসে অর্থাৎ তত্ত্বজ্ঞান-ত্যাগ-লয়বোধ-অপরোক্ষ-জ্ঞানানুভব কর্তৃক তুমি সর্ব্বতত্ত্ব-ত্যাগ অপরোক্ষ জ্ঞানানুভব সন্ন্যাসী হইবে। তৎকালে তোমার সকল সঙ্কল্প কল্পনা ভ্রান্তি এবং মায়া এককালে ত্যাগ হইবে। কিছু দিন বা কিছু মাস ব্যাপিয়া সম্পূর্ণ লয় অবস্থাতে অবস্থিতি করিবে। অতএব প্রথমতঃ সেই শুদ্ধ-চৈতন্য-সর্ব্বব্যাপী-ব্রহ্মজ্ঞান-আকাশ অথবা আত্মা-চৈতন্যকে কুণ্ডলী মধ্যে দণ্ডায়মান রাখিয়া, সেই ভূতাত্মিকা প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে দর্শন করিবে "ও সদানন্দরূপঃ

শিবময়োস্মি বা "ব্রহ্মময়োস্মি" এই শেষ চরণ যুক্ত শ্লোকটি ভক্তির সহিত জ্ঞানময়-জিহ্বা দ্বারা পাঠ করিয়া তাঁহাকে কহিবে "আমি তুমি নহি।"

দ্বিতীয়তঃ। এই জ্ঞানাকাশে বা আত্ম-চৈতন্যকে নাভি-মধ্যে আরোহণ করাইবে। এবং সেই স্থানে ইহাকে দণ্ডায়মান রাখিয়া একাগ্র ভক্তির সহিত পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া কহিবে "আমি তুমি নহি।"

তৃতীয়তঃ। অতিশয় ভক্তির সহিত জ্ঞানাকাশকে (আত্ম-চৈতন্যকে) জাগ্রত করিয়া হৃদয়-মধ্যে আরোহণ করাইবে। তৎকালে পূর্ব্বোক্ত মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবে। হৃদয়মধ্যে ইহাকে দণ্ডায়মান রাখিয়া ভাববৃত্তির অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন করিয়া ও পূর্ব্বোক্ত শ্লোক গান করিয়া কহিবে "আমি তুমি নহি।"

চতুর্থতঃ। জ্ঞানাকাশকে পূর্ব্বোক্তরূপে কণ্ঠ-মধ্যে আরোহণ করাইবে। এবং সেই স্থলে দণ্ডায়মান রাখিয়া অন্তঃকরণের অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন করিয়া ও পূর্ব্বোক্ত শ্লোক অতিশয় ভক্তি সহকারে গান করিয়া কহিবে "আমি তুমি নহি।"

পঞ্চম। জ্ঞানাকাশকে পূর্ব্বোক্তরূপে জিহ্বা-মধ্যে আরোহণ করাইয়া বিবেচনা-বৃত্তির অধিষ্ঠাত্রী-দেবীকে দর্শন করাইবে, এবং পূর্ব্বোক্ত শ্লোক ভক্তি সহকারে গান করিয়া কহিবে "আমি তুমি নহি।"

ষষ্ঠ। জ্ঞানাকাশকে এক্ষণে নাসাগ্র-মধ্যে আরোহণ করাইয়া কল্পনা-বৃত্তির অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন করাইবে, এবং ভক্তি সহকারে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক গান করিয়া কহিবে "আমি তুমি নহি।'

সপ্তম। জ্ঞানাকাশকে (আত্ম-চেতন) পরে ভ্রূর মধ্যে আরোহণ করাইয়া চিত্তের অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন করাইবে এবং ভক্তি সহকারে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া কহিবে "আমি তুমি নহি।"

অষ্টম। জ্ঞানাকাশকে বা আত্ম-চেতনকে ললাট-মধ্যস্থলে আরোহণ করাইয়া স্মৃতির অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন করাইবে এবং পূর্ব্বোক্ত শ্লোক ভক্তি সহকারে গান করিয়া কহিবে, "আমি তুমি নহি।"

নবম। পরে জ্ঞানাকাশ বা আত্মচেতনকে মস্তিকের অধোভাগে আরোহণ করাইয়া প্রজ্ঞার অধিষ্ঠাত্রীকে দর্শন করাইবে এবং ভক্তি সহকারে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক গান করিয়া কহিবে "আমি তুমি নহি।"

দশম। পরে মস্তিকের মধ্য-স্থানে আরোহণ করিয়া জ্ঞানের অধিষ্ঠাতাকে দর্শন করাইবে এবং ভক্তি ও একাগ্রতা সহকারে পূর্ব্বোক্ত শ্লোক পাঠ করিয়া কহিবে "আমি তুমি নহি"।

একাদশ। আত্মচেতনাকে মস্তিকের উপরিভাগে আরোহণ করাইয়া বুদ্ধিতত্ত্বের অধিষ্ঠাতাকে দর্শন করিবে, এবং আত্ম-চেতনকে সর্ব্বব্যাপী-চেতন-স্বরূপে আত্ম-দর্শনে সমাহিত করতঃ পূর্ব্বোক্ত শ্লোক গান করিয়া কহিবে "আমি তুমি নহি।"

দ্বাদশ। পরে সেই (আত্মচেতন) জ্ঞানাকাশ, শিরঃ কপালের মধ্যস্থল ব্রহ্মরন্ধ্রে আরোহণ করিয়া আপনাকে আপনি দর্শন করিবে এবং সেই বিজ্ঞানময় ও আত্ম-চেতনময় আপনাকে আপনি কহিবে, "আমি কেবল তুমি নহি, আমি ত্রিপুটী, আমি এস্থানে প্রথমতঃ দ্রষ্টা অর্থাৎ দর্শন-কর্ত্তৃ-স্বরূপ, দ্বিতীয়তঃ

দৃষ্টি বা দর্শন শক্তির স্বরূপ, তৃতীয়তঃ দৃশ্য বা যাহা দর্শন করা যায় সেই বস্তুর স্বরূপে অবস্থিত। যদিও আমি, আমার দ্রষ্টা-রূপ প্রথম সত্তাতে দৃষ্টিশক্তিরূপ দ্বিতীয় আত্মসত্তা মিলিত করিয়া আমার তৃতীয় আত্মসত্তাকে দর্শন করিতেছি তথাপি আমি এই তিন অবস্থার অতীত। আমি, সর্ব্বব্যাপী অনন্ত আধ্যাত্মিক চেতনময় সাক্ষীস্বরূপে, নিরাধার স্বয়ংভূরূপে অথবা সর্ব্বব্যাপিকা শক্তিময় ব্রহ্ম-স্বরূপে এবং নিত্য সদানন্দ ব্রহ্মস্বরূপে অবস্থিত আত্মচেতন, আত্মদর্শন-শক্তিস্বরূপ স্বীয় দ্বিতীয় সত্তাকে, চেতন-ময় দর্শনকর্ত্তার স্বরূপ আপনার প্রথম সত্তাতে পরিণত করিবার পূর্ব্বে অর্থাৎ দর্শন শক্তি রূপ চেতন, দর্শন কর্ত্তারূপ চেতনে পরিণত হইবার পূর্ব্বে, চিদানন্দরূপঃ শিবোঽহম্ শিবোঽহম্ প্রভৃতি প্রথম খণ্ডের শেষভাগ-স্থিত শ্লোক গুলি গান করিবে। পরে ওংত্বং মন্ত্রের দ্বারা আত্মভাবের দ্বিতীয়াবস্থায় পরিণত হইয়া, নির্ব্বিকল্প-অতিধীর-অঘোর-উগ্র-শাস্তাতীত মৌন-ব্রহ্মজ্ঞান রাজ-যোগ সম্পূর্ণ সমাধি লয়-বোধস্তম্ভনম্, এই ভাবে অবস্থিত হইবে। এই অবস্থাকে অখণ্ডাকার-ব্রহ্ম-মাত্র অথবা সর্ব্বব্যাপী একমাত্র অনন্তদৃষ্টি বলা যায়। ইহার আত্মদর্শন বা আত্মচেতন-ময়ী শক্তি সর্ব্বব্যাপিকা, সর্ব্বত্র সাক্ষিরূপে বর্ত্তমান। এই অবস্থায় ইহা নিত্য আনন্দ উপভোগ করে। ইহা সম্পূর্ণশূন্য-মাত্র, কারণ ইহাতে কিছু স্থাপন করা যায় না; কিছু পাওয়া যায় না, এবং কিছুই দৃষ্ট হয় না। যাহা ঘটিয়াছে যাহা ঘটিতেছে ও যাহা ঘটিবে, এই তিন কালেরই জ্ঞাতা, এই জন্য ইহাকে ত্রিকাল-জ্ঞানদৃষ্টি বলা যায়।

তুমি প্রথম প্রকরণে সিদ্ধি লাভ করিয়া পরোক্ষ ভাবনা-

ব্রহ্মজ্ঞান-ব্রহ্মচারী হইবে, এই অবস্থায় তুমি অন্তর আত্মার জ্ঞান লাভ করিবে। দ্বিতীয় প্রণালীতে সিদ্ধি লাভ করিলে, পরোক্ষ-জ্ঞান-রাজযোগ যাত্রীর অবস্থা প্রাপ্ত হইবে এবং যোগাভ্যাস প্রণালীতে সিদ্ধি লাভ করিবে। তৃতীয় প্রণালীতে সিদ্ধি লাভ করিলে দ্বাদশ-বৃত্তি বিচার করিয়া পরোক্ষ-তত্ত্বজ্ঞান-বিচার গৃহস্থী হইবে। চতুর্থ প্রকরণে সিদ্ধি লাভ করিলে সবিকল্প সমাধিতে পরোক্ষ তত্ত্ব জ্ঞান-লয়-ত্যাগ সন্ন্যাসী হইবে, অর্থাৎ দ্বাদশ বৃত্তি বিচার পূর্ব্বক পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস অবলম্বন করিবে। পঞ্চম প্রকরণে সিদ্ধি লাভ করিলে, প্রত্যক্ষ জ্ঞানময় চেতন (অর্থাৎ কেবল মাত্র চিন্তা বা অনুমান নহে) কুণ্ডলীতে অবতরণ করিয়া ব্রহ্মরন্ধ্রে আরোহণ পূর্ব্বক সুষুম্না ও কুম্ভক নাড়ী জ্ঞানে পরিপূর্ণ করিয়া, লয়-বোধ-আনন্দ-স্তম্ভন স্বরূপে নির্ব্বিকল্প সমাধি অবস্থায় অপরোক্ষ-ব্রহ্মজ্ঞান অতিবর্ণাশ্রম-নির্ব্বাণ-অবধূত মৌন-শান্ত-অতীত-সুষমী ব্রহ্মলিঙ্গ-স্বরূপ যোগীশ্বর হইবে। এই অবস্থায় জ্ঞানাকাশ বা আত্ম-চেতন শিরঃকপাল হইতে বহিঃ-স্থত হইয়া সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড এই ভাবে ব্যাপ্ত করিবে যথা,—

ব্রহ্মজ্ঞান শান্তাতীতম্।
ব্রহ্মজ্ঞান শূন্যাতীতম্।
ব্রহ্মজ্ঞান ব্যাপকাতীতম্।
ব্রহ্মজ্ঞান সাক্ষ্যাতীতম্।
ব্রহ্মজ্ঞান আনন্দাতীতম্।

এইরূপ নির্ব্বিকল্প সমাধিতে সম্পূর্ণ লয় হইলে, তুমি স্বয়ং ব্রহ্ম বা সর্ব্বব্যাপী অনন্ত আত্মা হইবে। যাবৎ এই দেহ ত্যাগ না কর তাবৎ যোগীশ্বররূ ভাবে অবস্থিতি করিবে। চিরকাল

অহরহ এই নিত্য আনন্দ ভোগ করিবে। এই অবস্থায় ত্রিপুটোঽহম্, দ্বৈতোঽহম্, ভেদোঽহম্, প্রভৃতি আর তোমার থাকিবে না। ব্রহ্মোঽহম্ শিবোঽহম্ নিত্যোঽহম্ শূন্যোঽহম্ সাক্ষ্যোঽহম্ একোঽহম্ অভেদোঽহম্ আনন্দোঽহম্ এইরূপ ভাব তোমার জন্মিবে। অতএব চিন্তা কর ইড়াকলা বা শক্তিকলা সৃষ্টিস্বরূপ জ্ঞান-চৈতন্য। সুষুম্না-কলা বা ব্রহ্মকলা শুদ্ধস্বরূপ জ্ঞান-চৈতন্য। এবং পিঙ্গলা-কলা বা শিব-কলা সংহাররূপ জ্ঞান-চৈতন্য। দ্বাদশ বৃত্তি এবং শান্ত শূন্য ব্যাপক সাক্ষী ও আনন্দ পূর্ব্বোক্ত এই পঞ্চ অবস্থার অতীত, একারণ এই যোগী-দিগকে ষোড়শান্ত-মূর্ত্তি বলে।

জ্ঞানরবি ক্রমে পশ্চিমে চলিল।
অজ্ঞান রজনী ভারতে ব্যাপিল॥
যশের কিরণ ঘুচিল তখনি।
মলিনা ভারত-গৌরব-নলিনী॥
বেদ-শশি তার দর্শন মণ্ডল।
তন্ত্র উপবেদ তারা গ্রহদল॥
অষ্টাদশ বিদ্যা চতুঃষষ্টি কলা।
ভারত গগণ করিত উজলা॥
দুর্ব্বোধ মেঘেতে কারে বা ঢাকিল।
কারে বা যবন রাহুতে গ্রাসিল॥
ক্রমে তমো ঘোর জ্ঞান-দৃষ্টি রোধ।
নাহি কর্ম্মাকর্ম্ম ধর্ম্মাধর্ম্ম বোধ॥
আর্য্যকুল চূড়া ছিল রে যাহারা।
সুধু জ্ঞান-রস-পানে মাতোয়ারা॥

জ্ঞানের লাগিয়ে লয় তেয়াগিয়ে।
ঐহিকের সুখে জলাঞ্জলি দিয়ে॥
লয়ে শাস্ত্র ধনে, জ্ঞান আলোচনে।
কাটাত জীবন বীজন কাননে॥
কৈ তপোধন সেই মুনিগণ।
সেই পুরাকালে এ মহিমণ্ডলে।
অশেষ বিজ্ঞান রচি জ্ঞান বলে॥
আর্য্য নাম যারা জগতে পাইল।
ভারত ভাগ্যেতে তারা কি ঘুমাল?
হা ভারতবাসী সেই পিতৃগণ।
গোত্রেতে যে নাম করেছ ধারণ॥
জাগিবে না কিরে আর এজগতে।
এবে পুত্রগণে নয়নে হেরিতে?

নহেত নিদ্রিত নহেত বিস্মৃত।
আর্য্য-শিরোমণি এখনো জাগ্রত॥
আছেন সকলে অচল শিখরে।
আর্য্য-হিত-কাম-জাগিছে অন্তরে॥
তাই সভাপতি ভারতের গতি।
করেতে বেদান্ত সেই মহামতি॥
অবতীর্ণ আসি ভারত মাঝারে।
জ্ঞান-যোগ-রত্ন বিলাইতে নরে॥
যেই যোগ বলে সেই পুরাকালে।
প্রকৃতির তত্ত্ব জানিল ভূতলে॥
সেই শক্তি-তত্ত্ব যাহার প্রভাবে।

সৃষ্টি স্থিতি লয় এ বিপুল ভবে ॥
দর্শনেতে যার মহিমা গাইল।
যোগ বলে তারা সকলি জানিল ॥
ভূতল হইতে খতল অবধি।*
রবি-শশি আর পৃথিবী পরিধি ॥
উচ্চ নীচ মান্দ গ্রহ সমাগম।
রাশিচক্র পথে গ্রহ পরিক্রম † ॥
ধনু রায়ু আর স্থপতি গান্ধর্ব্ব।
এ বিজ্ঞান গর্ভে ধরেছে অথর্ব্ব ‡ ॥

---

* জ্যোতিষ্ক মণ্ডল যে স্থানে অবস্থিত, শূন্য প্রদেশের সেই স্থানকে জ্যোতিষে খতল বলে। 'অবধি' অর্থে এ স্থলে "সীমা"।

† চন্দ্র সূর্য্য পৃথিবীর পরিধি ও দূরতা এবং গ্রহগণের গতির উচ্চ নীচতা প্রভৃতি গ্রহণ গণনার জন্ত যাহা কিছু জানা প্রয়োজন তাহা সমস্ত সূর্য্য সিদ্ধান্তে গ্রহণ গণনা অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

‡ ধনুর্ব্বেদে যুদ্ধ-বিদ্যা বিজ্ঞান, আয়ুর্ব্বেদে শারীর ও স্বাস্থ্য বিজ্ঞান, স্থাপত্য বেদে শিল্প প্রভৃতি ৬৪ প্রকার বিদ্যা বর্ণিত হইয়াছে, তাহাদিগকে কলা বলে। এবং গান্ধর্ব্ব বেদে সঙ্গীত বিজ্ঞান। এই চারিটি উপবেদ অথর্ব্ব বেদের অন্তর্গত। যৎকালে আর্য্যরীতি প্রচলিত ছিল, সেই কালে গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করিয়া যাঁহারা সংসার আশ্রম গ্রহণ করিতেন তাঁহারা এই সকল বিজ্ঞানের মধ্যে কোন প্রকার বিজ্ঞান অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন। এতদ্ভিন্ন জ্যোতিষ প্রভৃতি অষ্টাদশ বিদ্যা ও চতুঃষষ্টি কলার এস্থলে উল্লেখ করা হইল না। তাহারাও গৃহস্থদিগের জীবনোপায় ছিল।

যোগবলে তারা সকলি জানিল।
তাই আর্য্যনাম জগতে পাইল॥

উঠরে ভারতি ছাড়রে দুর্ম্মতি।
চল ভাই যথা বলে সভাপতি॥
শিক্ষার বিকারে ঘিরেছে তোমারে।
পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-গরিমা-তিমিরে॥
সভ্যতা তৃষ্ণায় শুষ্ক-কণ্ঠ প্রায়।
অন্তর্দাহ সদা অভাব-জ্বালায়॥
সে জ্বালা নিবাতে জীবন গোঁয়ালি।
আয্য-সুখ-শান্তি সব রে হারালি॥
এশিক্ষাতে ছাই আর কাজ নাই।
আর্য্যপথে পুন ফিরে চল ভাই॥
স্কন্ধে উত্তরীয় কৌশের পিধান।
শিখা সূত্রধারী শিরে শিরস্ত্রাণ॥
আছে যে রমণী জীবন সঙ্গিনী।
তব শিক্ষা দোষে এবে বিলাসিনী॥
ভক্তি-লাজ-ভূষা তাহারে পরাবে।
সে মোহিনী কান্তি বড় হে সাজিবে॥
অসার বাসনা স্বপ্নের কল্পনা।
ছাড় হে ইন্দ্রিয়-সুখের কামনা॥
ধরেছ এই যে মানব আকার।
তত্ত্বজ্ঞান তব জীবনের সার॥

জ্ঞান মাত্র সুখ জ্ঞান মাত্র ধন।
বুঝেছিল সেই আর্য্য পিতৃগণ ॥
যোগ বিশাণিত বুদ্ধি খরধারে।
ছেদ হে অজ্ঞান তিমির অন্তরে ॥
ব্রহ্ম জ্ঞানানন্দে তখনি ভাসিবে।
জ্ঞানামৃত পানে আপনা ভুলিবে ॥
এসংসার মায়া সকলি ঘুচিবে।
জ্ঞান যে কি ধন তখনি বুঝিবে ॥

সেই মহামতি দেব সভাপতি
গাইল এগীতি সভার মাঝে।
আর্য্য তত্ত্ব-জ্ঞান ছাড়ি অন্য জ্ঞান
ভারত সন্তানে নাহিক সাজে ॥
গাথা সমাপিল, তখনি চলিল,
যথা নীলাচল উন্নত কায়।
যথা যোগীগণ, ধ্যানেতে মগন,
জ্ঞানামৃত পানে বিহ্বল প্রায় ॥

আত্মজ্ঞান অনুসন্ধান।

১। শুভ এবং অশুভ কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে, শত কল্পেও মুক্তি লাভ হয় না।

২। স্বর্ণ ও লৌহ শৃঙ্খলের ন্যায় শুভাশুভ কর্ম্ম জীবের বন্ধন স্বরূপ হইয়া থাকে।

৩। অত্যর্থ কষ্ট স্বীকার করিয়া কর্ম্ম সাধন করিলেও আত্মজ্ঞান ব্যতিরেকে জীবের মুক্তি নাই।

৪। যাঁহারা আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সমুদয় জানিয়াছেন, যাঁহারা ফলের আকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগ পূর্ব্বক কর্ম্ম সাধন করেন, যাঁহারা বিজ্ঞ এবং বিশুদ্ধাত্মা, তাঁহাদিগেরই আত্মজ্ঞান লাভ হইয়া থাকে।

৫। এই বিশ্ব সংসারে ব্রহ্ম হইতে তৃণ পর্য্যন্ত সমস্তই মায়া দ্বারা কল্পিত, কেবল পরব্রহ্ম মাত্র সত্য, এই জ্ঞান জন্মিলে লোক প্রকৃত সুখ লাভ করিতে পারে।

৬। যাঁহারা নাম ও রূপ পরিত্যাগ করিয়া নিত্য নিশ্চল ব্রহ্মে, একাগ্রভাবে চিত্ত স্থির করিয়াছেন তাঁহারাই কর্ম্ম পাশ হইতে মুক্ত হইয়া থাকেন।

৭। জপ, হোম উপবাসাদি দ্বারা মুক্তিলাভ হয় না, আপনাকে ব্রহ্মস্বরূপে জানিলে দেহ পাশ হইতে মুক্তি লাভ হয়।

৮। আত্মাই সকলের সাক্ষী, সর্ব্বব্যাপী, পূর্ণ সত্য দ্বৈত-হীন এবং সর্ব্বাতীত, দেহে থাকিয়াও দেহে বদ্ধ নহেন, এই জ্ঞান জন্মিলে জীব মুক্ত হইয়া থাকে।

৯। এই বিশ্বসংসারে সকল প্রকার আকার ও নাম বালকের ক্রীড়া-দ্রব্য, যাঁহার চিত্ত এই সকল পরিত্যাগ করিয়া ব্রহ্মে নিমগ্ন হইয়াছে, তিনিই মুক্তির ভাজন।

১০। যদি মনের কল্পিত প্রতিমূর্ত্তির উপাসনার দ্বারা মুক্তিলাভ হয়, তবে স্বপ্নে রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াও রাজা হওয়া যায়।

১১। যাহারা কায়িক কষ্ট সহ্য করে এবং ঈশ্বরকে মৃন্ময় পাষাণময় বা ধাতুময় বলিয়া কল্পনা করে, যাবৎ প্রকৃত জ্ঞান না জন্মে তাবৎ তাঁহাদিগের মুক্তি লাভ হয় না।

১২। ব্রহ্মজ্ঞান বিহীন হইয়া, যাহারা বিবিধ সুরাপানে আনন্দ অনুভব করে এবং উত্তম আহার দ্বারা শরীরের পুষ্টি সাধন করে তাহাদিগের পরিত্রাণের উপায় কি ?

১৩। কেবলমাত্র বায়ু, গলিত-পত্র বা তণ্ডুল-কণা ভক্ষণ বা কেবলমাত্র জলপান দ্বারা জীবন ধারণ, এইরূপ কঠোর ব্রতে যদি মোক্ষ লাভ হয়, তবে পশুপক্ষি সর্প ও জলচরেরাও মোক্ষ লাভ করিতে পারে।

১৪। আমি ব্রহ্ম, এই ভাবনাই উৎকৃষ্ট সাধন, স্তুতি ও ধ্যান মধ্যম, জপ অধম, এবং বাহ্য পূজা অতি অধম।

১৫। পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার ঐক্যই যোগ, শিব ও কেশবের উপাসনাই, পূজা। যিনি এই বিশ্বসংসারকে ব্রহ্মরূপে দর্শন করেন, তাঁহার যোগ বা পূজা কিছুই প্রয়োজন হয় না।

১৬। সকল জ্ঞানের সার ব্রহ্মজ্ঞান যাঁহার হৃদয়ে বিরাজিত, তাঁহার জপ হোম ক্রিয়া বা অন্য কঠোর ব্রতাদির প্রয়োজন কি ?

১৭। সত্য-জ্ঞান-আনন্দময় ব্রহ্মকে যিনি প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মের স্বরূপ লাভ করিয়াছেন, তাঁহার পূজা বা ধ্যান ধারণার প্রয়োজন কি ?

১৮। যিনি সকল ব্রহ্মময় বলিয়া জানিয়াছেন তাঁহার পুণ্য-পাপ স্বর্গ বা পুনর্জন্ম, ধ্যেয় বা ধ্যাতা কিছুই নাই।

১৯। আত্মা সর্ব্বদাই মুক্ত, ইহা সর্ব্বময় অথচ কিছুতেই লিপ্ত নহে, কেই বা ইহাকে বন্ধন করিতে পারে, এবং কেনই বা অল্প-বুদ্ধি লোক ইহার মুক্তি কামনা করে ?

২০। সমস্ত বিশ্ব স্বীয় মায়াতে রচিত, সেই মায়া দেবতারাও বুঝিতে পারেন না। ইহা স্বয়ং সর্ব্বত্রব্যাপী, এই বিশ্বের অন্তরে, আছে বলিলে হয়, নাই বলিলেও হয়।

২১। এই স্বয়ংভূ সর্ব্ব সাক্ষি স্বরূপ আত্মা আকাশের ন্যায় সকল বস্তুর অন্তরে ও বাহিরে বিরাজমান।

২২। আত্মার বাল্য যৌবন বা জরা নাই, তিনি নিত্য সৎ নির্ম্মল জ্ঞানস্বরূপ এবং নির্ব্বিকার।

২৩। জন্ম, জরা, যৌবন শরীরের ঘটে, আত্মার নহে, লোক ইহা দেখিয়াও দেখেনা, সুতরাং মায়াতে আবৃত হইয়া থাকে।

২৪। সূর্য্য এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন জলপাত্রে তাহার প্রতিবিম্ব ভিন্ন ভিন্ন দেখা যায়, সেইরূপ আত্মা এক হইয়াও ভিন্ন ভিন্ন শরীরে মায়া কর্ত্তৃক ভিন্ন ভিন্নরূপে প্রতিবিম্বিত হয়।

২৫। যেমন জলের চাঞ্চল্যে জলস্থিত চন্দ্রের প্রতিবিম্বও চঞ্চল দেখায়, সেইরূপ বুদ্ধির চাঞ্চল্যে বুদ্ধিস্থ আত্মার প্রতিবিম্বকেও চঞ্চল দেখায়।

২৬। যেমন ঘট ভগ্ন হইলেও ঘট-মধ্যস্থিত আকাশ পূর্ব্বের ন্যায় থাকে, সেইরূপ দেহ নাশ হইলেও আত্মা সমভাবেই থাকেন।

২৭। হে দেবি! আত্মজ্ঞানই মুক্তি লাভের উপায়, এই জ্ঞান জন্মিলেই মোক্ষ লাভ হয়, ইহা সত্য এবং নিশ্চয়।

২৮। কর্ম্ম মন্ত্র বা স্তোত্র দ্বারা মুক্তি হয় না, কেবল আত্মার দ্বারা আত্মাকে জানাই মুক্তির উপায়।

২৯। আত্মাই সকলের প্রিয়, আত্মা ব্যতিরেকে প্রীতির

বিষয় আর কিছুই নাই। অন্য যে কোন বস্তুতে প্রীতি জন্মে তাহাও আত্মার সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত।

৩০। জ্ঞান জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতা মায়া কর্তৃক পরস্পর ভিন্ন বোধ হয়, আত্মাকে জানিলে তাঁহাতে এই তিন জ্ঞানই উপলব্ধি হয়।

৩১। নির্ম্মল চিন্ময় আত্মাই জ্ঞান, চিন্ময় আত্মাই জ্ঞেয় অর্থাৎ জ্ঞানের বিষয়, এবং চিন্ময় আত্মাই জ্ঞাতা, ইহা যিনি জানিয়াছেন, তিনিই আত্মাকে জানিয়াছেন।

৩২। নির্ব্বাণের প্রত্যক্ষ কারণ এই জ্ঞান তোমাকে কহিলাম, ইহা চতুর্ব্বিধ অবধূতের পরম ধন।

বেদান্ত এবং যোগের সার সংগ্রহ।

প্রশ্ন। বেদান্ত এবং যোগের অধিকারী কে?

উত্তর। যাঁহার চিন্তা সমূহ বিশুদ্ধ, বাক্য কোমল, ক্রিয়া পবিত্র, অন্তকরণ সকলের প্রতি সদয়। যিনি সংসারে থাকিয়াও ইহাতে বদ্ধ নহেন এবং মুক্তি কামনা যাঁহার অন্তরে নিয়ত প্রজ্জলিত।

প্র। ঐইরূপ মুমুক্ষু ব্যক্তি কিরূপে আত্মজ্ঞান লাভ করিয়া থাকেন?

উ। সাধন চতুষ্টয়ের দ্বারা যথা—

(১) প্রকৃত অপ্রকৃত, বিকৃত অবিকৃত এবং নিত্য ও অনিত্য এই প্রভেদ করণ, এবং ব্রহ্মই একমাত্র সত্য বলিয়া নিশ্চয় জ্ঞান।

(২) নিঃস্বার্থ হইয়া কার্য্য করণ, এবং ইহ পরলোকে ফলের কামনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান করা।

(৩)। শ্রদ্ধা সহিষ্ণুতা শম দম ত্যাগ এবং চিত্তের একাগ্রতা এই গুলির অভ্যাস।

(৪) নির্ব্বাণ লাভের অত্যর্থ বলবতী ইচ্ছা।

প্র। বেদান্তের বিষয় কি ?

উ। ক্লেশ নিবারণ করাই সকল দর্শন শাস্ত্রের উদ্দেশ্য; সাংসারিক দর্শন বিদ্যা সমূহ ভৈষজ্যদর্শন বিদ্যার ন্যায় ক্ষণকালের নিমিত্ত যাতনার শান্তি করে কিন্তু পুনর্ব্বার হয়। প্রকৃত দর্শন-শাস্ত্র দ্বারা নিত্য সুখ ও শান্তি লাভ হইয়া থাকে। বেদান্ত দ্বারা তাহাই হয়, এইটি উচ্চতম তত্ত্ব বিদ্যা।

প্র। এই উক্তির প্রমাণ কি ?

উ। প্রমাণ ত্রিবিধ—শাস্ত্র, যুক্তি এবং অভিজ্ঞতা।

প্র। শাস্ত্র প্রমাণ কি আছে ?

উ। বেদ চতুষ্টয় এবং উপনিষদ্ সমূহের প্রাকৃতিক-নিয়ম-সঙ্গত অর্থ, এবং ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন দেশের মহাত্মাগণের উপদেশ-বাক্য।

প্র। বেদ হইতে এরূপ কতকগুলি উপদেশ বাক্য উদ্ধার কর, যদ্দ্বারা পরমাত্মার সহিত জীবাত্মার একত্ব প্রতিপন্ন হয় ?

এই সকল উপদেশ বাক্যকে মহাবাক্য বলে যথা,—(১) তত্ত্বমসি, সেই (ব্রহ্ম) তুমি এই (জীব)। অথবা এই তুমি সেই। (২) অয়মাত্মা ব্রহ্ম, এই আত্মাই ব্রহ্ম। (৩) একমেবাদ্বিতীয়ম্, একমাত্র দ্বিতীয় রহিত। (৪) তস্য ভাসা সর্ব্বমিদম্ বিভাতি, তাঁহার জ্যোতিতেই এই সংসার প্রকাশমান্ রহিয়াছে।

(৫) যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি, যিনি এই পুরুষ (ব্রহ্ম বা আত্মা) তিনিই আমি। (৬) দ্বৈতাদ্বৈ ভয়ম্ ভবতি, দ্বৈত ভাব হইতে ভয় উৎপত্তি হয়। (৭) নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, এই বিবিধ আকার বিশিষ্ট সংসার কিছুই নহে। (৮) সর্ব্বম্ খল্বিদং ব্রহ্ম, এই সমস্তই ব্রহ্মময়।

প্র। বিজাতীয় মহাত্মাগণের কিরূপ উপদেশ বাক্য আছে উল্লেখ কর?

উ। সক্রেটিস্ কহিয়াছেন প্রকৃতিগত সমতা প্রযুক্ত এই আত্মা ঈশ্বরের সহিত সংসৃষ্ট।

২। প্লেটোর এইরূপ বিশ্বাস, যে জগত প্রতিবিম্ব মাত্র, অপ্রকৃত এবং ঐশী-জ্ঞানের প্রতিবন্ধক।

৩। সিসিরো কহিয়াছেন আমি সপথ করিয়া বলিতে পারি যে আত্মা ঐশি-ভাব-সম্পন্ন।

৪। ম্এ অটোনাইন্‌স্ কহিয়াছেন যে আত্মা বিজ্ঞানময় ও ঈশ্বরের অংশ।

৫। প্রোটিনস্ উপদেশ দিয়াছেন যে অন্তঃকরণের বৃত্তি সকল বর্জ্জিত করিলে আমরা পরমাত্মার সহিত অভিন্ন।

৬। ফাইলো কহিয়াছেন যে মানবের আত্মা ঐশী-ভাব-সম্পন্ন। *

৭। প্রোক্লস্ কহেন যে তোমার অন্তরস্থ ঐশীতত্ত্ব জানিতে পারিলে বুঝিতে পারিবে যে তোমার আত্মা ঐশী-ভাবের রশ্মি মাত্র।

৮। স্পাইনোজা কহেন "ঈশ্বরই কেবল মাত্র সদ্বস্তু।

৯। মন্‌মুর একজন মহম্মদীয় অসম্বদ্ধ-ভাষী, শলাকা বিদ্ধ

করিয়া তাহার প্রাণ নাশ করা হয়, কারণ তিনি বলিতেন "আনল হক্" অর্থাৎ আমি ঈশ্বর।

১০। হাফেজ, শামসী-তাবরিজ, মালানা রুমী, আবু আলি কালেণ্ডার, ইঁহারা সকলেই বৈদান্তিক ছিলেন। খ্রীষ্ট বলিতেন তোমরা ঈশ্বর।

প্র। আত্মা ঈশ্বরাংশ এবং জগত স্বপ্নময়, ইহার যুক্তি কি?

উ। জীবাত্মা যদি ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বলিয়া বিশ্বাস করিতে হয় তাহাতে এই তর্ক উপস্থিত হয় যে ঈশ্বরের সহিত আমাদিগের সম্বন্ধ কি? যদি নিয়ন্তা বলিয়া স্বীকার করা যায়, তবে তাহাকে নিষ্ঠুর বলিতে হয়, কারণ এই সংসার ক্লেশ-পূর্ণ করিলেন কেন? অতএব সংসার স্বপ্নময় স্বীকার করিলে এই সংশয় থাকে না *। জাগ্রত স্বপ্ন ও সুষুপ্তি এই তিন অবস্থা

---

* "সংসার ক্লেশ-পুর্ণ, অতএব ইহার সৃষ্টিকর্ত্তাকে নিষ্ঠুর বলিতে হয়" মূল গ্রন্থকার ঈশ্বরে এইরূপ নিষ্ঠুরতা দোষ আরোপিত না হয়, একারণ জীব ও ঈশ্বরের অভেদ স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু জীব ও ঈশ্বরের অভেদ প্রতিপন্ন করিবার পক্ষে এই যুক্তিটি পরিষ্কার বোধ হইতেছে না। জীব ও ঈশ্বরের অভেদ প্রতিপন্ন করিতে হইলে উভয়ের বস্তুগত অভিন্নতা দেখান প্রয়োজন। অতএব জীবেশ্বরের অভেদ প্রতিপন্ন করিবার জন্য আমরা যুক্তি অন্তর অবলম্বন করিতেছি যথা—জীব বা আত্মা বা আমি বলিতে গেলে অন্তর হইতে একটি জ্ঞানময় বা চেতনময় ভাবমাত্র প্রকাশ পায়। অতএব আত্মাকে যদি চেতনময় বলিতে হয়, তবে ঈশ্বর যিনি ইহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন তিনি সচেতন কি না? যদি তিনি সচেতন না হন তবে তাহাতে অর্থাৎ অচেতনে ইচ্ছা ও ক্রিয়া সম্ভবে না, যদি চেতনময় হন,

ভেদে আমাদিগের জ্ঞানেতেও অবস্থা ভেদ হয়, জাগ্রত অবস্থার জ্ঞানে যে সকল ভাবের উদয় হয়, তাহা স্বপ্নাবস্থায় থাকে না, এবং স্বপ্নাবস্থার ভাব সুষুপ্তি অবস্থায় থাকে না। অতএব ভাব বা কল্পনা যে অবস্থায় উদয় হয় সেই অবস্থাতেই সত্য, অবস্থান্তর হইলে তাহার অন্যথা হয়। অতএব কোন অবস্থার কল্পনা বা ভাবই সত্য নহে, অস্থায়ী। যে ভাব স্থায়ী নহে তাহাই স্বপ্ন, একারণ জাগ্রত বা নিদ্রিত এ উভয় অবস্থার ভাবই স্বপ্নময়, সুতরাং সংসার স্বপ্ন-ময়, কেবল সকল ভাবের আধার জ্ঞানময় আত্মাই সদ্বস্তু।

প্র। দুই ব্যক্তির স্বপ্ন সমান হয় না, এক স্বপ্নও পুনঃ পুনঃ দেখা যায় না, তবে এই সংসার কিরূপে স্বপ্ন হইল? কারণ, ইহাকে সকল ব্যক্তিই একরূপ দেখিতেছে, এবং সকল কালেই একরূপ দৃষ্ট হইতেছে।

উ। এই সংসার সামান্য লোকের স্বপ্ন নহে, এই ব্রহ্মাণ্ড ব্রহ্ম-চৈতন্যে স্বপ্নরূপে উদিত। যেমন কোন সম্মোহন-বিদ্যা-কুশল ব্যক্তি স্বীয় বলবতী ইচ্ছার প্রভাবে দর্শকগণকে যাহা ইচ্ছা তাহাই দর্শন শ্রবণ বা অনুভব করাইতে পারেন, সেইরূপ ব্রহ্ম-চৈতন্যের মায়া বা ইচ্ছা-শক্তির দ্বারা এই সংসার প্রকাশ পাইয়াছে। তাঁহার ইচ্ছা যে আমরা এইরূপ দেখিব ও এইরূপ করিব। যখন আমরা তাঁহার স্বরূপ হইতে পারিব তখন এই মায়া নিবৃত্তি পাইবে।

তবে চেতন সৃষ্টির বিষয় হইতে পারে না ইহা স্বয়ংভু, সুতরাং জীব-চেতন বা আত্মা সৃষ্ট বস্তু নহে, ঈশ্বর বা চৈতন্য-দেবের অবস্থা বিশেষ মাত্র।

প্র। যদি এই সংসার স্বপ্নময় হইল, তবে ধর্ম্মাধর্ম্ম ভাল মন্দ কিছুই নাই, এবং আমরা আমাদিগের কর্ম্মের ফল-ভোগীও হইতে পারি না।

উ। পারমার্থিকী দৃষ্টিতে এই সংসার স্বপ্নময়, কিন্তু ইন্দ্রিয় বা দৈহিক সম্বন্ধে এবং ব্যবহারিক দৃষ্টিতে আমাদিগের সত্য বিবেচনা কর্ত্তব্য। যেমন সম্মোহনকারী ব্যক্তি সুরা বলিয়া জলপান করিতে দিলে সম্মোহিত ব্যক্তি সেই জলপানেই উন্মত্ত হয়, সেইরূপ যাবৎ মায়া পাশ হইতে মুক্ত না হওয়া যায় তাবৎ কর্ম্মের ফলভোগ করিতে হইবে, কারণ কর্ম্ম করা ও কর্ম্ম করিলে ফলভোগ করা, এই দুইটিই মায়ার কার্য্য বা নিয়ম। (একটি ঘটিলে অপরটি অপরিহার্য্য)।

প্র। জীব এবং পরমাত্মার অভেদ, অভিজ্ঞতার দ্বারা কি রূপে প্রমাণ করিতে পার ?

উ। যে সকল মহাত্মাগণ নির্ব্বাণের দ্বার-দেশে উপনীত হইয়াছেন, তাঁহাদিগের জীবন-বৃত্তান্তে ইহা নিসংশয়ে প্রতিপন্ন করিতেছে। যে সকল শক্তি আমরা ঈশ্বরে আরোপ করি, তাঁহাদিগেরও সেই সকল শক্তি আছে। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, শঙ্করাচার্য্য এবং খ্রীষ্ট, এইরূপ মহাত্মাগণের কার্য্যের দ্বারা জানা যায় যে তাঁহারা ঈশ্বর।

প্র। কি উপায়ে ঈশ্বরের সহিত ঐক্যতান সংস্থাপিত হয় ?

উ। যোগাভ্যাসের দ্বারা।

প্র। যোগ কি ?

উ। চিত্তের বৃত্তি নিরোধই যোগ।

প্র। যোগ কত প্রকার ?

উ। প্রাচীন ঋষিগণ যোগ বহুবিধ বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন যথা,—কর্ম্মযোগ, হঠযোগ, মন্ত্রযোগ, রাজযোগ ইত্যাদি। এস্থলে কেবল হঠযোগ ও রাজযোগেরই উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্র। হঠযোগ এবং রাজযোগে প্রভেদ কি ?

উ। হঠযোগ,—শারীরিক কৌশলাদি অভ্যাস দ্বারা ইচ্ছাশক্তির প্রাঢ্যতা সাধন; এবং রাজযোগ—মানসিক অভ্যাস দ্বারা ইচ্ছা-শক্তির প্রাঢ্যতা সাধন। হঠযোগ অধম, রাজযোগ মধ্যম এবং শিব-রাজযোগ (আধ্যাত্মিক প্রণালী) উচ্চতম প্রণালী।

প্র। রাজযোগ কি রূপে অভ্যাস করিতে হয় ?

উ। যোগের অধিকারী পূর্ব্বে বলা হইয়াছে; উদ্বেগশূন্য স্থানই যোগাভ্যাসের স্থান, যে কালে মন বিশুদ্ধ ও আধ্যাত্মিক ভাবে উন্নত থাকে, তাহাই যোগাভ্যাসের কাল। শরীরের স্বভাবতঃ সচ্ছন্দ অবস্থাই ইহার উপযোগী। যম, নিয়ম আসন প্রাণায়াম প্রত্যাহারও সংযম, এই ষড়ঙ্গ যোগ অভ্যাস করিবে।

প্র। যম কি ?

উ। যম, যোগের প্রথম সোপান, ইহাতে পাঁচটি অভ্যাস করিতে হয়। (১) অহিংসা,—কোন প্রকারে জীবের হিংসা বা অনিষ্ট না করা, এবং আমিস আহার বর্জ্জন। (২) সত্য—সকল অবস্থাতেই সত্য বলা কর্ত্তব্য। (৩) অস্তেয়—অপহরণ না করা। (৪) ব্রহ্মচর্য্য—শুক্রধারণা এবং কার্য্যে ও মনে পবিত্রতা। (৫) অপরিগ্রহ—ইহ পরলোকের সকল বস্তুতেই লোভ-শূন্য হওয়া।

প্র। নিয়ম কি ?

উ। নিয়মও পাঁচটি, শৌচ—শরীর ও মনের নির্ম্মলতা ; সন্তোষ—কখন যে অবস্থা তাহাতেই তুষ্ট থাকা ; তপঃ—ইন্দ্রিয়ের নির্ম্মলতা সাধন ; স্বাধ্যায়—মনে মনে কোন প্রকার মন্ত্রোচ্চারণ, যথা, শিবায়বসী ; ঈশ্বর-প্রণিধান—ঈশ্বরে একান্ত ভক্তি।

প্র। কি আসনে উপবিষ্ট হওয়া কর্ত্তব্য।

উ। যে আসনে স্থির ও স্বচ্ছন্দ ভাবে থাকা যায়। ইহা কদাচ পরিবর্ত্তন করিবে না।

প্র। তাহার পর কি করা কর্ত্তব্য।

উ। সুখাসনে স্থিরভাবে উপবিষ্ট হইয়া, যদি ইচ্ছা হয় প্রাণায়াম অভ্যাস করিবে। রাজযোগের পক্ষে প্রাণায়াম নিতান্ত প্রয়োজনীয় নহে। রেচক পূরক, কুম্ভক, শ্বাসের এই ত্রিবিধ ক্রিয়াকে সচরাচর প্রাণায়াম বলে। প্রথমতঃ দক্ষিণ হস্তের সকল অঙ্গুলি দ্বারা বাম নাসা-রন্ধ্র বদ্ধ রাখিয়া, দক্ষিণ নাসা-রন্ধ্রের দ্বারা শ্বাস ত্যাগ করিবে, ইহাকে রেচক বলে। এই রূপ শ্বাস ত্যাগ করিয়াই দক্ষিণ হস্তের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ দ্বারা দক্ষিণ নাসা-রন্ধ্র বদ্ধ রাখিয়া, বাম নাসা হইতে অঙ্গুলি সকল তুলিয়া লইয়া, সেই বাম নাসা-পুট দ্বারা শ্বাস গ্রহণ করিবে, ইহাকে পূরক বলে। পরে উভয় নাসা-পুট বদ্ধ রাখিয়া শ্বাস ধারণ করিবে, ইহাকে কুম্ভক বলে। এইরূপে শ্বাস ধারণার পর পূর্ব্বোক্তরূপে রেচক করিবে কুম্ভক বা শ্বাসের ধারণা ৩০ ত্রিস সেকেণ্ড কাল হওয়া উচিত। এই কালের পরিমাণ স্থির করিবার জন্য "শিবায়বসী" এই মন্ত্র ত্রিংশৎ বার জপ করিবে। প্রাণায়াম সম্পূর্ণ অভ্যাস হইলে, প্রত্যাহার তাহার অনুবর্ত্তি হয়, অর্থাৎ

অভ্যাসকারীর বাহ্য ব্যাপার উপলব্ধি হয় না। তৎকালে তাহার শরীরে আঘাত করিলে বা তাহার নিকট বিকট নাদ করিলে, তিনি কিছুই জানিতে পারিবেন না। রাজযোগে প্রত্যাহার সিদ্ধির কারণ প্রাণায়াম অভ্যাসের প্রয়োজন নাই।

প্র। রাজযোগ কিরূপে অভ্যাস করিতে হয় ?

উ। রাজযোগের তিন প্রকার অভ্যাস—

(১)। ইন্দ্রিয় সংযম, ইন্দ্রিয়গণকে বশীভূত করা।

(২)। মনঃ সংযম, মনকে বশীভূত করা।

(৩)। লয়, বিশুদ্ধ-চৈতন্য-স্বরূপে মনের একীভূত হওয়া।

ইন্দ্রিয় সংযম বা প্রত্যাহার অভ্যাস করিতে হইলে, দৃঢ় চিত্তে চিন্তা কর যে তুমি শরীর হইতে বহিঃস্কৃত হইয়া আকাশে বিচরণ করিতেছ। এইটি কিছুদিন (মাস কতক) অভ্যাস করিবে, যাবৎ এরূপ শক্তি না জন্মে, যে যখনই ইচ্ছা কর তখনি শরীরকে অচেতন করিতে পার। এইটি ক্রমে ক্রমে অভ্যাস করিলে সহজ হইবে। একান্ত ইচ্ছা কর যে তুমি বাহ্য শব্দ গ্রহণ করিবে না, এতদূর অভ্যাস করিবে যে তুমি যখন ইচ্ছা করিবে তখনি আপনাকে বধির করিতে পারিবে। ইহা কঠিন বটে কিন্তু অসম্ভব নয়। শ্রবণেন্দ্রিয়কে জয় করিয়া, দর্শন রসন ঘ্রাণ এবং স্পর্শন ইন্দ্রিয়গণকে পরাভূত করিয়া, অন্তরিন্দ্রিয় এবং ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতিকে পরাজয় করিবে। দৃঢ় বিশ্বাস এবং সহিষ্ণুতা সহকারে অভ্যাস করিলে অবশ্যই সিদ্ধি লাভ হইবে।

প্র। মনঃসংযম কি প্রকার ?

উ। যিনি ইন্দ্রিয় দমন করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে মন জয়

করা কঠিন নহে। প্রথমতঃ স্মৃতি পরে বুদ্ধি-বৃত্তি সমুদয়কে পরিত্যাগ বা জয় করিবে, পরে চিন্তা-বৃত্তি রহিত করিবে। এই রূপে ক্রমে ক্রমে অন্তঃকরণের বৃত্তি সমুদয় জয় করিবে। এই রূপ অভ্যাসে নির্ম্মল চেতনময় জীবাত্মা ইন্দ্রিয় বৃত্তি এবং অন্তঃকরণ-বৃত্তি-রূপ বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করেন। মুক্ত অবস্থা লাভ হইলে লয় অবস্থা প্রাপ্ত হইতে যত্ন করিবে, এবং ঐশিভাবে নিমগ্ন হইয়া তাহার সহিত একীভূত হইবে। এই অবস্থাকে কৈবল্য বলে, ইহা সর্ব্ব শেষে লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু এই অবস্থা লাভের অনেক পূর্ব্বে যোগীগণ তাহাদিগের শ্রমের পুরস্কার স্বরূপ আধ্যাত্মিক শক্তি বা সিদ্ধি সকল লাভ করিয়া থাকেন। প্রথম ইন্দ্রিয় সংযমের অবস্থাতেই তিনি দূর-দর্শন এবং অন্যের অন্তরের ভাব অনুভব করণে সমর্থ হন। যোগের সমুদয় রহস্য, যেরূপ সভাপতি স্বামি পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিয়াছেন, "ঐশিতত্ত্ব আবির্ভাবের জন্য আপনার অন্তর এককালে শূন্য করিবে।" দর্শন শাস্ত্রের রহস্য "আত্মাকে জানিবে" কিন্তু নির্ব্বাণ বা ঐশিতত্ত্বের রহস্য "আপনাকে শূন্য জ্ঞান করিবে।"

সমাপ্ত।